বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ

বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা-৯

পিতৃদেব

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

শ্রীচরণকমলেষু

শান্তি-র বই

গৃহসন্ধানে

যেতে নাহি দিব

সুন্দর, হে সুন্দর

শিখারূপিণী

মেঘ ও চাঁদ

ঊর্মিমালা

পিছু ডাকে

রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী

রবীন্দ্রনাথের পূরবী

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা

জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র

গল্পকার শরৎচন্দ্র

গ্রন্থবার্তা

বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ

নিবেদন

বাংলা গদ্যকে যাঁরা গড়ে পিটে তৈরি করেছেন, এতে প্রাণ ও লাবণ্য সঞ্চার করেছেন, বর্তমান গ্রন্থে তাঁদের সম্বন্ধেই আলোচনা করেছি। এঁদের কেউ-বা গদ্যের নির্মাতা (maker), কেউ বা কলাকার (artist)। ইংরেজিতে এই ধরণের আলোচনা প্রচুর হয়েছে, বাংলায় এই প্রথম প্রয়াস। প্রথম বলেই এতে ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। এ সম্পর্কে সমালোচনা ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

এই গ্রন্থরচনায় প্রথম উৎসাহ পাই অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ও অগ্রজোপম সুসাহিত্যিক শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। গ্রন্থ রচনায় বিশেষ সাহায্য পেয়েছি ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ সুকুমার সেন ও শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর লেখা থেকে। যাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনায় উপকৃত হয়েছি, তাঁরা হলেন: শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল, শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীগোপাল হালদার ও ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। এঁরা সবাই আমার অধ্যাপক বা অধ্যাপক-কল্প। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত অনুগ্রহ করে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁর এই স্নেহ-অভিজ্ঞান লাভ করে আমি কৃতার্থ হয়েছি।

আমার পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায় যদি নিরন্তর সস্নেহ তাড়না না করতেন তাহলে এই গ্রন্থ লেখা হত না। তাঁর স্নেহের ঋণ অপরিশোধ্য। বন্ধুবর শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অপরিচিত লেখকের গ্রন্থ প্রকাশ করে যে দুঃসাহস দেখিয়েছেন তার জন্য তাঁকে অজস্র সাধুবাদ জানাই।

আর যাঁরা সুপরামর্শ দিয়ে ও সমালোচনা করে সাহায্য করেছেন, তাঁরা হলেন শ্রীমতী মালবিকা দত্ত, শ্রীতরুণ মিত্র, অধ্যাপক শ্রীমান শক্তিব্রত ঘোষ ও আমার অনুজ শ্রীমান বরুণকুমার। এঁদের সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক। ধন্যবাদে তার শোধ হয় না।

বিবেকানন্দ কলেজ
কলিকাতা-৮
১৭ই জুলাই ১৯৫৭

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতক একদিকে বাঙলা-গদ্যের প্রস্তুতি-কাল—আবার ইহাই বাঙলা-গদ্যের সৃষ্টির যুগও। এই প্রস্তুতি-কাল এবং সৃষ্টিকালের মধ্যে ব্যবধান ছিল লক্ষণীয়রূপেই অল্প। সম্ভবতঃ তাহার কারণ ছিল নবজাগরণ-জাত উৎসাহ ও প্রেরণা। ঊনবিংশ শতকের প্রথমপাদেও চলিতেছিল প্রস্তুতি; দ্বিতীয় পাদ হইতেই সৃষ্টির চেতনা ও কৌশল—তৃতীয় পাদেই সৃষ্টি-শক্তির পূর্ণজাগরণ—চতুর্থপাদে পূর্ণাঙ্গ পরিণতি। প্রাণধর্মের দ্রুতস্পন্দনেই জাত এই দ্রুতবিবর্তন।

বাঙলা-গদ্যের এই দ্রুতপরিবর্তন-জাত পরিণতির মধ্যে স্বভাবতঃই দেখা দিয়াছে প্রেরণা এবং প্রযুক্তির নানাবিধ বৈচিত্র্য; এই বৈচিত্র্য অনেক সময় দেখা দিয়াছে বিবর্তনের স্তররূপেও—আবার শিল্পিগণের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের চিহ্ন-রূপেও। এই বৈচিত্র্যের স্তর এবং বৈশিষ্ট্যকে প্রণিধানপূর্বক লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে; সেই প্রয়োজন রহিয়াছে ইতিহাসের দিক হইতেও—সাহিত্যাস্বাদনের দিক হইতেও। বাঙলা-গদ্যের এই ক্রম-বিবর্তন এবং ক্রম-পরিণতি সম্বন্ধে তাই যথেষ্ট আলোচনা করিবার অবসরও রহিয়াছে—প্রয়োজনও রহিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুত অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সেই কাজে ব্রতী হইতে দেখিয়া সুখী হইয়াছি। 'বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ' গ্রন্থখানি সাদর অভ্যর্থনার দাবী রাখে।

আমরা এই বিংশ শতকের মধ্যভাগে যে বাঙলা-গদ্যকে একটা সহজ সামাজিক উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছি সেই গদ্যকে দেড়শত বৎসর পূর্বে যাঁহারা প্রথম গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের সাধনাকে নিরাপদে 'নমস্য' বলিয়া দূরে রাখিলে চলিবে না। তাঁহারা তাঁহাদের হাতের কাছে ব্যবহারযোগ্য কি কি উপাদান পাইয়াছিলেন—আর সেই উপাদানকে তাঁহারা কি কৌশলে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—

সে চেষ্টার ফল কোন্ সময়ে কিরূপভাবে দেখা দিয়াছিল ইহার প্রত্যেকটি জিনিসকেই বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার প্রয়োজন রহিয়াছে।

সেই বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে সাহিত্যের দিক হইতে আর একটি জিনিস আবার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রয়োজনের তাগিদ মানুষের সকল ব্যক্তি-বৈশিষ্টকে চাপিয়া ঢাকিয়া একাকার করিয়া দেয়; সুতরাং সেই প্রয়োজনের যুগটীর যে ফসল তাহা হয় বর্ণবৈচিত্র্যহীন মোটামুটি একটা রসদমাত্র। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সেই প্রয়োজন-ধর্মকে অতিক্রম করিয়া ওঠাই হইল মনুষ্যের সাধারণ ধর্ম;—তাহার ভিতর দিয়াই জাগে মানুষের শিল্পধর্ম; গদ্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই প্রয়োজন-ধর্মের মধ্যেই তাই দেখিতে পাই শিল্প-ধর্মের উঁকি-ঝুঁকি—পাথরের ফাটলে ফাটলে সোনার রেখার মত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে দেখি বাঙলাগদ্যে প্রয়োজনধর্মেরই প্রাধান্য; দ্বিতীয় পাদে দেখি এই প্রয়োজন-ধর্মের সহিত শিল্পধর্মের মিশ্রণ; তৃতীয়-পাদে দেখি প্রয়োজন-ধর্মের উপরে শিল্পধর্মেরই প্রাধান্য; চতুর্থ পাদে শিল্পধর্মেরই দৃঢ় প্রতিষ্ঠা।

অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বাঙলা-গদ্যের এই শিল্প-ধর্মকেই মুখ্যভাবে লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; তাই তাঁহার আলোচনার ভিতরে তিনি সকল গদ্যলেখকের কথা উল্লেখ করেন নাই; মৃত্যুঞ্জয় হইতে আরম্ভ করিয়া শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাঙলাগদ্যের লেখকগণের মধ্য হইতে তিনি মোট বাইশ জন লেখককে বাছিয়া লইয়াছেন—যে বাইশজনকে তিনি বাঙলা গদ্য-লেখকগণের মধ্যে শিল্পী বলিয়া মনে করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রত্যেক লেখকের শিল্পবৈশিষ্ট্যই যে বেশ স্পষ্টগ্রাহ্য তাহা বলা যায় না; তবে শক্তি-শালী লেখক যাঁহারা তাঁহারা প্রত্যেকেই নূতন সম্ভারে এবং নূতন কৌশলে ভাষা ও সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টাতে লেখকগণের লেখার মধ্যে লেখকগণের ব্যক্তিধর্মের স্পর্শ লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই ব্যক্তিধর্মের স্পর্শেই গড়িয়া উঠিয়াছে লেখকগণের স্টাইল। এই স্টাইলের আলোচনাই হইল অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের মুখ্য করণীয়। প্রত্যেক লেখকের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের একটা সাধারণ পরিচয় দিয়া তিনি সেই লেখকের লেখার

কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া সেই লেখার মধ্য দিয়া পূর্বব্যাখ্যাত লক্ষণগুলির সন্ধান দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই বৈশিষ্ট্যানুসন্ধানে লেখকের চিন্তা ও বিশ্লেষণের পরিচ্ছন্নতা প্রশংসার্হ; তাঁহার প্রকাশের স্পষ্টতাও লক্ষণীয়। নিজের মতন করিয়া তিনি ভাবিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং সেই ভাবনার দ্বারা যে মতামত গড়িয়া উঠিয়াছে তাই পাঠকসমাজের সম্মুখে তিনি উপস্থাপিত করিয়াছেন। তবে লেখক আমার পরম স্নেহভাজন বলিয়া কিছু ভবিষ্যৎ নির্দেশও তাঁহাকে দিতেছি। তিনি যে বিষয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন সে বিষয়ে আমাদের আলোচনাগ্রন্থ পরিমাণে এবং গুণে স্বল্প; কিন্তু তথাপি প্রাথমিক আলোচনা কিছু কিছু ইহার পূর্বেই হইয়াছে; আলোচনার এই প্রাথমিক পর্ব অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশের সময় আসিয়াছে। শুধু মাত্র দিগ্‌দর্শন না করিয়া বিষয়ে আরও ব্যাপক এবং গভীরভাবে প্রবেশের প্রয়োজন। গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণের সময়ে লেখক আমাদের এই কথা স্মরণ রাখিলে গ্রন্থের উপযোগিতা সমধিক বর্ধিত হইবে। বর্তমানে তিনি যতটুকু অগ্রসর হইয়াছেন তাহাই সাদর সম্বর্ধনার যোগ্য—সে কাজে আমি বাঙলা-সাহিত্যের বৃহৎ পাঠকগোষ্ঠীর সহিত নিজেকেও সানন্দে যুক্ত করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৪।৭।৫৭

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত
রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক

কথারম্ভ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলা ভাষা-পরিচয়' গ্রন্থে ভাষার আশ্চর্য রহস্য চিন্তা করে বিস্মিত হয়ে বলেছেন : 'আজ যে বাংলা ভাষা বহু লক্ষ মন-চলাচলের হাজার হাজার রাস্তায় গলিতে আলো ফেলে সহজ করেছে পরস্পরের প্রতি মুহূর্তের বোঝাপড়া, আলাপ-পরিচয়, এর দীপ্তির পথরেখা অনুসরণ করে চললে কালের কোন্ দূরদুর্গম দিগন্তে গিয়ে পৌঁছব'। ভাষার এই সুদুর্গম পথরেখার অনুসন্ধান ভাষাবিজ্ঞানীরা করেছেন। তাঁদের সমবেত সাধনায় আজ এই শাস্ত্র বৈজ্ঞানিক সূত্র ও নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভাষার দুই রূপ—পদ্য ও গদ্য। পদ্যের জন্ম আগে, গদ্য এসেছে পরে। দুনিয়ার তাবৎ ভাষাতেই কবিতা-গাথা-গান রচিত হয়েছে সাহিত্যের প্রথম পর্বে, গদ্য এসেছে সাহিত্যের পরিণত যৌবনে। তাই এই দুই ভাষা এক নয়। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি, 'মানুষের বুদ্ধিসাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে বিজ্ঞানে। হৃদয়বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ কাব্যে। দুইয়ের ভাষায় অনেক তফাত। জ্ঞানের ভাষা যতদূর পরিষ্কার হওয়া চাই; তাতে ঠিক কথাটার ঠিক মানে থাকা দরকার, সাজসজ্জার বাহুল্যে সে যেন আচ্ছন্ন না হয়। কিন্তু ভাবের ভাষা কিছু যদি অস্পষ্ট থাকে, যদি সোজা করে না বলা হয়, যদি তাতে অলংকার থাকে উপযুক্তমতো, তাতেই কাজ দেয় বেশি। জ্ঞানের ভাষায় চাই স্পষ্ট অর্থ; ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয়তো অর্থ বাঁকা করে দিয়ে।' ('বাংলাভাষা-পরিচয়', পৃ ২২)।

গদ্য তাই জ্ঞানের ভাষা, তার অর্থ হবে স্পষ্ট, সাজসজ্জার বাহুল্যে সে আচ্ছন্ন হবে না। গদ্যে মানুষের চিন্তা, যুক্তি, বুদ্ধি ও জ্ঞানের সাধনা প্রকাশ পায়। তাই কোনো সাহিত্যের গদ্য যখন সংহত ও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখনি বল্‌তে পারি যে সাহিত্যের জ্ঞানের বিভাগটি সমৃদ্ধ হয়েছে, তার অধিকারী যে মন তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

ইংরেজি সাহিত্যে ঠিক এই ব্যাপারটি ঘটেছে। পোপ্-এর সময় থেকে শুরু করে ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্কট পর্যন্ত সাহিত্যের যে পর্ব (১৭৪৫-১৮৩২), সেটিকে ইংরেজি গদ্যের পর্ব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর আগে বা পরে ইংরেজি গদ্যের চর্চা ছিল না, তা নয়; কিন্তু এই পর্বটি বিশেষভাবে গদ্যের পর্ব —জ্ঞানের, যুক্তির, তর্কের, বিচারের পর্ব। গদ্য এর যোগ্যতম বাহন। ইংরেজি গদ্য এই পর্বেই সাবলীল, স্বচ্ছন্দ, শক্তিশালী ও গুরুভারবহনক্ষম হয়ে ওঠে। এই পর্বে লণ্ডন ও এডিনবরাকে কেন্দ্র করে ইংরেজি সংবাদপত্রের দ্রুত বিকাশ ঘটে; হ্যানোভার বংশীয়দের রাজত্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়; যানবাহনের ও ডাকের উন্নতি হয়; সাধারণ মানুষ ক্রমশ সংবাদপত্র ও গ্রন্থের লোভী পাঠকে পরিণত হয়; সর্বোপরি ফরাসি বিপ্লবের অনুগ্রহে ফরাসি চিন্তাধারার সঙ্গে সাধারণ ইংরেজ পরিচিত হয় এবং জর্মান সাহিত্য ও ধর্মান্দোলনের মারফতে জর্মান চিন্তাধারার পরিচয় লাভ করে। এই সবের সম্মিলিত ফল ইংরেজি গদ্য সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও বিকাশ। ইংরেজি গদ্যের মহারথীরা এই পর্বে দেখা দেন: সুইফ্‌ট্, ডীফো, এ্যাডিসন্, বার্ক্‌লে, স্টিল, ডক্টর জনসন, হিউম, গীবন, এ্যাডাম স্মিথ, বার্ক, টমাস পেইন, কোল্‌রিজ, ওঅর্ডস্‌ওয়র্থ, ডী কুইন্সি, ল্যাণ্ডর, ল্যাম্, জেরেমি বেন্‌থাম্, সাদে, মূর, ক্রস্, লকহার্ট, হ্যালাম, মিটফোর্ড। সাহিত্য-সম্পর্কিত আলোচনা, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভ্রমণ, ধর্মালোচনায় এই গদ্য-রথীরা সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। একটি নোতুন যুগের—জ্ঞানের, বুদ্ধির, যুক্তির জগৎ প্রতিষ্ঠিত হল। তারপর স্কটের হাতে—তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাসনিচয়ে—ইংরেজি গদ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হল। ট্যাট্‌লার, স্পেক্‌টেটর, গার্ডিয়ান, মর্নিং ক্রনিক্‌ল, টাইমস্, মর্নিং পোস্ট, এডিনবরা রিভিউ, কোয়ার্টার্লি, ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিন প্রভৃতি পত্রিকার পাতায় এই যুক্তি ও তর্কের, সংশয় ও জ্ঞানের, বিচার ও বিশ্লেষণের আলোচনা দেখা দিল। ফলে ইংরেজি গদ্য পূর্ণ-যৌবন প্রাপ্ত হল, তা গুরুচিন্তা প্রকাশে সক্ষম, দুরূহ তত্ত্ব প্রচারে সমর্থ হয়ে উঠল। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসকার এক কথায় বলেছেন, 'A good prose style had been perfected, and the method of writing being made easy, production increased. Men

were born, as it were, into a good school of the art of composition.'

ইংরেজি সাহিত্যের যে পর্বটির কথা এখানে উল্লেখ করলাম, তার প্রতিচ্ছবি দেখি একশ বছর পরেকার বাংলা দেশে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যে এই গদ্যের যুগ—চিন্তা ও জ্ঞানের, বুদ্ধি ও যুক্তির, মনন ও বিশ্লেষণের, বিচার ও তর্কের যুগ এসেছিল। সে যুগের নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, যেমন ইংরেজি গদ্যের নায়ক ডক্টর জনসন্। তাই উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই গদ্যের পর্বটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। তত্ত্ববোধিনী-বঙ্গদর্শন-বান্ধব-সাধারণী নবজীবন-সাধনার পাতায় যে সাহিত্যচর্চা হয়েছিল, তা কেবল বাংলা সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেনি, বাংলা গদ্যকেও সবল ও বলিষ্ঠ, দ্রুতগতি ও সাবলীল করে তুলেছিল। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যকে, একদিক থেকে বলা যায়, যুক্তি ও বিচারের সাহিত্য। আর সেই সাহিত্যের যোগ্য বাহন বাংলা গদ্য।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে এই বাংলা গদ্যকে যাঁরা গড়ে তুলেছেন, তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করেছি। Prose-maker বলতে যা বোঝায় বাংলায় তার উপযুক্ত প্রতিশব্দ পাইনি। 'গদ্যস্রষ্টা' নামটি স্বতঃই মনে আসে, কিন্তু বড় নীরস মনে হয়। স্রষ্টা, নির্মাতা, স্থপতি, শিল্পী—কোনো সংজ্ঞাই যথেষ্ট ব্যাপক নয়। 'বাংলা গদ্যের শিল্পীসমাজ' নামটি-ই সব থেকে সঙ্গত বলে আমার মনে হয়। গদ্যকে শিল্পসৌন্দর্যের মর্যাদায় ধীরে ধীরে যাঁরা উন্নীত করেছেন—তাদের গোষ্ঠিকে আমি শিল্পীসমাজ বলেছি। বাংলার বড় বড় প্রবন্ধকার আমার আলোচনার ক্ষেত্র নন। যাঁরা বাংলা গদ্যকে গড়ে-পিটে তুলেছেন, দুরূহ চিন্তা প্রকাশে সক্ষম ও সূক্ষ্ম তত্ত্বালোচনার যোগ্য বাহন করে তুলেছেন, আমি কেবল তাঁদেরই গদ্যরীতি বা স্টাইল সম্পর্কে আলোচনা করেছি। মূলতঃ তাঁদের প্রবন্ধাবলীকে ভিত্তি করেই এই আলোচনা করা হয়েছে। সেইজন্য সুপ্রচুর উদ্ধৃতি অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিক বাংলা গদ্যে উনিশ শতকী সততা

ও নিষ্ঠার যে অভাব দেখা গেছে, সে সম্পর্কে শেষ দুটি প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। নিম্নলিখিত বাইশ জন গদ্য লেখকের সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে বাংলা গদ্যের উদ্ভব, বিকাশ, সমৃদ্ধি ও পরিণতি দেখাবার চেষ্টা করেছি। এই বাইশজন হলেন : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী মুলেন্স, কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, স্বামী বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যাঁরা বাংলা গদ্যকে গঠন করেছেন, তাঁদের অনেকের নাম আমরা জানি, আবার অনেকের নাম জানিও না। বাংলা গদ্য যখন সবেমাত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে তখন যাঁরা এর স্থাপত্যকর্ম করেছিলেন, তাঁদের অন্যতম হলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার। দুঃখের বিষয় এঁর নাম আমরা ভুলেছি। রামমোহন রায়কে গদ্যশিল্পীরূপে মর্যাদা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগরের জয়ধ্বনি করেছেন রবীন্দ্রনাথ; প্যারীচাদ মিত্রের ভাগ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রধান পৃষ্ঠপোষক জুটেছিল, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের ভাগ্যে এই রকম কোনো পৃষ্ঠপোষক বাংলা দেশে জোটেনি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মৃত্যুঞ্জয়ের যে প্রতিষ্ঠা ছিল, তা শেষার্ধে দ্রুত অবলুপ্ত হয়েছে এবং আজ আমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছি। অথচ সত্যি কথা বলতে কি, প্রাক্-বিদ্যাসাগর যুগের বাংলা গদ্যের একমাত্র সচেতন শিল্পী (conscious artist) হলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার (১৭৬২-১৮১৯) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, পরে কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পাদ্রী উইলিয়ম কেরীর শিক্ষাগুরু ছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন: "১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত-গ্রন্থ' প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে যাঁহারা বাংলা-গদ্যে গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে—রামরাম বসু, উইলিয়ম কেরী, গোলোকনাথ শর্মা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি ও হরপ্রসাদ রায়। পাণ্ডিত্য ও ভাষার গুণ বিচার না করিয়াও শুধু রচিত-পুস্তকের সংখ্যাধিক্যেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার এই দলের প্রধান। গোলোক শর্মা, তারিণীচরণ, রাজীবলোচন, চণ্ডীচরণ,

রামকিশোর ও হরপ্রসাদ প্রত্যেকেই একখানি করিয়া এবং কেরী ও রামরাম প্রত্যেকেই দুইখানি করিয়া সাহিত্যবিষয়ক গদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। একা মৃত্যুঞ্জয়ই ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে চারিখানি গ্রন্থ—'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ', 'রাজাবলী' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' রচনা করেন, তন্মধ্যে প্রথম তিনখানি তাঁহার জীবিতকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।"

মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পূর্ণ গ্রন্থতালিকা এখানে তুলে দিচ্ছি: (১) বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), (২) হিতোপদেশ (১৮০৮), (৩) রাজাবলি (১৮০৮), বেদান্ত-চন্দ্রিকা (১৮১৭), (৫) প্রবোধচন্দ্রিকা (রচনা: ১৮১৩; প্রকাশ: ১৮৩৩)।

এই প্রবন্ধে মৃত্যুঞ্জয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য ও হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞান সম্পর্কে কোনো আলোচনা করছি না। জজ-পণ্ডিত রূপে সহমরণের বিরুদ্ধে তিনি যে 'পাঁতি' দিয়েছিলেন, সেজন্য তাঁর ঔদার্য ও প্রগতিচিন্তার, সমাজসংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহের প্রশংসা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বাংলা গদ্যের স্রষ্টা হিশেবে তাঁর দাবীর যৌক্তিকতা বিচারই এখানে উদ্দেশ্য।

গদ্যস্রষ্টা মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে প্রথম কথা হচ্ছে—তাঁর অদ্বিতীয় ভাষাজ্ঞান। সংস্কৃতে অনায়াস অধিকারের ফলে তিনি দুরূহ শাস্ত্রবিচারকে আয়ত্ত করেছিলেন এবং সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র ও কাব্যে অশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। ফলে স্টাইল (গদ্যরীতি) সম্পর্কে তাঁর শিল্পীমন সচেতন হয়ে উঠেছিল।

এর ফল ফলেছে বাংলা গদ্যে। তিনি বাংলা লিখতে বসেই একটা নিজস্ব স্টাইল খাড়া করেছিলেন এবং সাধু ও চলিত—এই দুই ভিন্ন রীতির পার্থক্য বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। এই কৃতিত্ব মৃত্যুঞ্জয়কে সচেতন শিল্পী হিশেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বিদ্যাসাগর, টেকচাঁদ, হুতোম, বঙ্কিমচন্দ্রের বহু পূর্বে যে তিনি সাধু ও চলতি গদ্যরীতি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলেন এতে বিস্মিত না হয়ে পারি না। তাঁর পাঁচটি গ্রন্থ একই স্টাইলে রচিত নয়, বক্তব্য-ভেদে ও গুরুত্ব-ভেদে তিনি স্টাইল বদলেছেন।

মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, একথা ঠিক। কিন্তু সেই জ্ঞান তাঁর সাহিত্যকর্মের পথে অচলায়তন সৃষ্টি করেনি, পরন্তু তাঁর মনকে উদার, সংস্কারমুক্ত ও গ্রহণেচ্ছু করে তুলেছে। কেরীকে তিনি যেমন সংস্কৃত-

বাংলা শিখিয়েছেন, তেমনই নিজে কেরীব কাছে ইংরেজি গদ্যের ঔদার্য ও শিল্পজ্ঞানেব পাঠ নিয়েছেন।

মৃত্যুঞ্জয়ের বাংলা রচনার কাল হচ্ছে ১৮০২ থেকে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দ। এই সময়ে বাংলা গদ্য সবে গড়ে উঠেছে—তখন তা দুর্বল ও অপটু। সেই দুর্বল বাংলা গদ্যে প্রাণসঞ্চারেব কৃতিত্ব দাবী করতে পাবেন মৃত্যুঞ্জয়, কেননা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাই তাঁকেই বাংলা গদ্যেব জনক আখ্যা দিতে পারা যায়। তাবপর বিদ্যাসাগব সাহিত্যিক গদ্যেব প্রথম শিল্পী রূপে দেখা দিলেন।

মৃত্যুঞ্জয়ের পাঁচটি গদ্যগ্রন্থেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'প্রবোধচন্দ্রিকা'। মৃত্যুব অব্যবহিত পূর্বে রচিত এই গ্রন্থে মৃত্যুঞ্জয় তাঁর ভাষানৈপুণ্যেব চরম পরিচয় দিযে গেছেন। এখন তাঁর স্টাইলেব ক্রমোন্নতি ও পরিণতিব যৎকিঞ্চিৎ প্রমাণ উদ্ধার করছি। এতেই তার দাবী সপ্রমাণিত হবে।

(১) হে মহাবাজ শুন রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না। বক্তমাংস মল মূত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে আত্যন্তিক প্রীতি করা জ্ঞানী জনের উপযুক্ত নয় প্রীতি যেমন সুখদায়ক বিচ্ছেদে ততোধিক দুঃখদায়ক হন অতএব নিত্য বস্তুতে মনোভিনিবেশ জ্ঞানীব কর্ত্তব্য। নিত্য বস্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরম পুরুষ ব্যতিবেক কেহ নয় তাঁহাতে মন সুস্থির হইলে জীব অসার সংসাব কারাগাব হইতে মুক্ত হন। [বত্রিশ সিংহাসন, পৃ ২৭, ব্রজেন্দ্রনাথ-সম্পাদিত মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী]।

(২) দ্বাববতী নামে পুরীতে কোন গোপের বধূ থাকে সে ভ্রষ্টা গ্রামের কোটালের এবং তাহার পুত্রের সহিত ক্রীড়া কবে পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন কাষ্ঠেতে অগ্নি তৃপ্ত হয় না নদীতে সমুদ্র তৃপ্ত হয় না সমস্ত প্রাণিতেও যম তৃপ্ত হয় না পুরুষেতে স্ত্রী তৃপ্ত হয় না। অপব স্ত্রী লোক দানেতে তুষ্ট হয় না ও সম্মানেতে তুষ্ট হয় না ও সারল্যেতে তুষ্ট হয় না ও সেবাতে তুষ্ট হয় না ও শস্ত্রেতে

বশীভূতা হয় না শাস্ত্রেতে বশীভূতা হয় না যেহেতুক স্ত্রী জাতিরা সর্ব্ব প্রকারে বিষম। [হিতোপদেশ, পৃ ৮১]।

(৩) যে সিংহাসনে কোটি কোটি লক্ষ স্বর্ণদাতারা বসিতেন সেই সিংহাসনে মুষ্টিমাত্র ভিক্ষার্থী অনায়াসে বসিল। যে সিংহাসনে বিবিধ প্রকার রত্নালঙ্কার-ধারিরা বসিতেন সে সিংহাসনে ভস্মবিভূষিত সর্ব্বাঙ্গ কুযোগী বসিল। যে সিংহাসনে অমূল্য রত্নময় কিরীটধারি রাজারা বসিতেন সেই সিংহাসনে জটাধারী বসিল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের নিকট অনাবৃত অঙ্গে কেহ যাইতে পারিত না সেই সিংহাসনে স্বয়ং দিগম্বর রাজা হইল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের সম্মুখে অঞ্জলীকৃত হস্তদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া লোকেরা দাঁড়াইয়া থাকিত সেই সিংহাসনের রাজা স্বয়ং উর্দ্ধবাহু হইল। [রাজাবলি, পৃ ১৩৪]।

(৪) দক্ষিণ দেশে উজ্জয়িনী নামে নগরীতে দাক্ষিণাত্য রাজরাজীশিরোরত্ন-রঞ্জিতচরণ উজ্জয়িনীবিজয় নামে এক সার্ব্বভৌম মহারাজ ছিলেন। তাঁহার পুত্র বীরকেশরিনামা এক দিবস অরণ্যান্তরালে মৃগয়া করিয়া ইতস্ততো বন ভ্রমণজনিত পরিশ্রমেতে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তরুণিস্তনসুন্দর ইন্দীবর কৈরব-কোরক সুন্দরীমুখমনোহরান্দোলিতোৎফুল্লরাজীব নির্ম্মল সুস্নিগ্ধজল পুষ্করিণী তটস্থলে বটবিটপিচ্ছায়াতে নিদাঘকালীন দিবসাবসান সময়ে বটজটাতে ঘোটক বন্ধন করিয়া নিজভৃত্যজনসমাজাগমন প্রতীক্ষাতে উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর রাজদ্বারস্থিত ঘটীযন্ত্রস্থ দণ্ডতাম্রীতুল্য দিবাকর জলনিমগ্ন ন্যায় অস্তমিত হইলেন। [প্রবোধচন্দ্রিকা, পৃ ২৭১-৭২]।

(৫) তাহার স্ত্রী কপালে করাঘাত করিয়া ও মা একি হইল শিয়ালের কামড় বড় মন্দ না জানি মোর ভাগ্যে কি আছে অভাগিনী জন্মদুঃখিনী মুই। মোরা চাস্ করিব ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো ছেলেপিলাগুণি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মসুর শাক পাত শামুক গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা কঞ্চী তুঁষ ও বিলঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি। কাপাস তুলি তুলা করি ফুড়ী পিঁজী পাঁইজ করি চরকাতে সূতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি।

আপনি মাঠে ঘাটে বেড়াইয়া ফলফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাতায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পোণেক দশ গণ্ডা যা পাই। ও মিন্‌সা পাড়াপড়সিদের মুনিস্ খাটিয়া দুই চারি পোণ যাহা পায় তাহাতে তাঁতির বাণী দি ও তেল লুণ করি কাটনা কাটি ভাড়া ভানি ধান কুড়াই ও সিজাই শুকাই ভানি খুদ কুঁড়া ফেণ আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়া যে দিন খাই সে দিন তো জন্মতিথি। [প্রবোধচন্দ্রিকা, পৃ ২৮৯]।

(৬) পঞ্চকোট বনমধ্যে এক ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রী সুখে বাস করে। কালপ্রভাবে ঐ বাঘিনীর কাল হওয়াতে ব্যাঘ্র স্ত্রীবিয়োগে অতিকাতর হইয়া বিবাহার্থ উন্মত্তপ্রায় হইল। স্বয়ং অনেক অন্বেষণ করিয়া কোথায় কন্যা না পাইয়া পথিকেরদিগকে ভক্ষণ করিয়া বস্ত্রালঙ্কার স্বর্ণরূপ্যাদি যথেষ্ট সামগ্রী লইয়া রাত্রিকালে এক ঘটক ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে আসিয়া গম্ভীর স্বরে ডাকিয়া কহিল। ঘটক ঠাকুর তোমরা সকলের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বিবাহের মধ্যস্থ হইয়া পণের অংশ কিছু পাইয়া শুভকর্ম লগ্নানুসারে সম্পন্ন করিয়া থাক। আমি আগেই প্রচুর ধন আনিয়াছি তাহা নির্ভয়ে লও আমার বিবাহ যেরূপে হয় তাহা শীঘ্র কর। কন্যার কুল শীল সৌন্দর্য্য বয়স আমার কিছু নির্ব্বন্ধ নাই যেমন তেমন একটা স্ত্রী মাত্র হইলেই হয়। [প্রবোধচন্দ্রিকা, পৃ ৩০৪]।

(৭) পরমার্থদর্শী ধার্ম্মিক সৎপুরুষেরদের নির্ম্মলজলবদ্‌বুদ্ধিতে বেদান্তসিদ্ধান্ত বিস্তারার্থে তৈলকণাবৎ বেদান্তসিদ্ধান্তলেশমাত্র প্রক্ষেপ করা গেল আর যেমন মণি পথে ঘাটে পড়িয়া থাকে না কিন্তু তৎপরীক্ষকেরা উত্তম সংপুটেতে অতি যত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন তেমনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু সুপক্ক বদরীফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে। আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থ-বোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণমাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হন। [বেদান্তচন্দ্রিকা, পৃ ২১৩]।

উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে আমরা লক্ষ্য করি: বিষয়-ভেদে গদ্যের চাল

বদ্‌লেছে—যেখানে বিষয় গুরু গদ্যভঙ্গীও সেখানে মন্থর ও গম্ভীর, যেখানে বিষয় লঘু গদ্যের চাল সেখানে হাল্কা, দ্রুততর। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ষষ্ঠ উদাহরণ বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতি মনে করিয়ে দেয়। চতুর্থ ও সপ্তম উদাহরণ তারাশঙ্কর তর্করত্নের কাদম্বরীর স্টাইল মনে করায়। পঞ্চম উদাহরণ হুতোমী ও আলালী ভাষার পূর্বপুরুষ বলে মনে হয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এঁদের সকলের আগে গদ্যচর্চা করেছেন। তাঁর গদ্যে দুটি মাত্র বস্তুর অভাব আছে—প্রয়োজনীয় বিরতি ও সাহিত্যসুষমা। এ দুটি এসেছে বিদ্যাসাগরের গদ্যে।

তাই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের গদ্যকে সাধু ও চল্‌তি গদ্যের পুরোধা বলতে পারি এবং বাংলা গদ্যের প্রথম স্রষ্টা (maker)—এই আখ্যা দিতে পারি। মৃত্যুঞ্জয়ই বাংলা গদ্যের প্রথম সচেতন শিল্পী—তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যের বিশৃঙ্খল জনতাকে সুবিন্যস্ত, সুবিভক্ত ও সুসংযত করে সহজ গতি দান করেন। সৌধ সমাপ্তির পর আমরা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কথা ভুলে যাই, কিন্তু তাতে ভিত্তিপ্রস্তরস্থাপয়িতার গৌরব লঘু হয় না। আজ বাংলা গদ্যের বিশাল সৌধের কক্ষে কক্ষে নানা গীতধ্বনি মন্দ্রস্বরে তরল সুরে গভীর সুরে বেজে উঠছে, কিন্তু একদিন—উনিশ শতকের সূচনায়—মৃত্যুঞ্জয় এই গীতধ্বনির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা' আজ যেন না ভুলে যাই। সে যুগের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক বিদেশী পাদ্রী জন ক্লার্ক মার্শম্যান্ মৃত্যুঞ্জয় সম্পর্কে যে প্রশস্তি উচ্চারণ করেছিলেন, আজ তার প্রতিধ্বনি করে বাংলা গদ্যের প্রথম স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি: At the head of the establishments of Pundits [at the college of Fort William] stood Mritunjoy, who usually regarded as the Boeotia of the country, was a colossas of literature. He bore a strong resemblance to our great lexicographer [Dr. Johnson], not only by his stupendous acquirements and the soundness of his critical judgment, but also in his rough features and unwieldly figure. His knowledge of the Sanscrit classics was unrivalled, and his Bengalee composition has never been surpassed for ease, simplicity, and vigour.

(দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী, ভূমিকা)।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার পরবর্তীকালের অন্যতম প্রধান গদ্যস্রষ্টা প্রমথ চৌধুরীর স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন, এ খবর আমাদের অজানা। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণে (১৩২১, ফাল্গুন) চৌধুরী মশায় 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উধৃত পঞ্চম উদাহরণ উদ্ধার করে বলেছিলেন, "এ ভাষা সজীব সতেজ সরল স্বচ্ছন্দ ও সরল। ইহার গতি মুক্ত, ইহার শরীরে লেশমাত্রও জড়তা নাই। এবং এ ভাষা যে সাহিত্য-রচনার উপযোগী, উপরোক্ত নমুনাই তাহার প্রমাণ। এই ভাষার গুণেই বিদ্যালঙ্কারমহাশয়ের রচিত পল্লিচিত্র পাঠকের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে।······আমার বিশ্বাস, আমাদের পূর্ববর্তী লেখকেরা যদি বিদ্যালঙ্কারমহাশয়ের রচনার এই বঙ্গীয় রীতি অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে কালক্রমে এই ভাষা সুসংস্কৃত এবং পুষ্ট হইয়া আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিত।" কিন্তু তা হয় নি, ফলে দীর্ঘ আশি বৎসর আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে, সবুজপত্রে চৌধুরীমশায় এই কর্তব্য সমাপন করেছেন॥

রামমোহন রায়

ভারতপথিক রামমোহন রায় (১৭৭৪—১৮৩৩) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "ভারতের চিত্ত সেদিন মনের অন্ন নূতন ক'রে উৎপাদন করতে পারছিল না, তার খেত ভরা ছিল আগাছার জঙ্গলে। সেই অজন্মার দিনে রামমোহন রায় জন্মেছিলেন সত্যের ক্ষুধা নিয়ে। ইতিহাসের প্রাণহীন আবর্জনায়, বাহ্যবিধির কৃত্রিমতায় কিছুতে তাঁকে তৃপ্ত করতে পারলে না। কোথা থেকে তিনি নিয়ে এলেন সেই জ্ঞানের আগ্রহে স্বভাবত উৎসুক মন, যা সম্প্রদায়ের বিচিত্র বেড়া ভেঙে বেরল, চারিদিকের মানুষ যা নিয়ে ভুলে আছে তাতে যার বিতৃষ্ণা হোলো। সে চাইল মোহমুক্ত বুদ্ধির সেই অবারিত আশ্রয় যেখানে সকল মানুষের মিলনতীর্থ।" (চরিত্র পূজা, পৃঃ ৫৮)

রামমোহন রায় এই মোহমুক্ত বুদ্ধির উপাসক। জীবনের সব কর্মে তিনি এই মোহমুক্তির সাধনা করেছেন। তিনি যুক্তি ও ন্যায়ের উপাসক ছিলেন, আজীবন pure reason ও practical reason-এর চর্চা করে এসেছেন। তাঁর গদ্যচর্চা মূলত এই যুক্তি ও ন্যায়কে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনা। এই জন্যই তিনি ইংরেজি ভাষা-দর্শন-সাহিত্য ও শাসনকে বরণ করে নিয়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর কথায় বলতে পারি, "ইংরেজের হাতে পড়ে আমাদের জীবনের ও মনের যে আমূল পরিবর্তন ঘটবে, ভারত-সভ্যতা যে নবকলেবর ধারণ করবে, এ সত্য সর্বাগ্রে রাজা রামমোহন রায়ের চোখেই ধরা পড়ে। সে যুগে তিনি ছিলেন একমাত্র লোক, যাঁর অন্তরে ভারতের ভবিষ্যৎ সাকার হয়ে উঠেছিল। তাঁর সমসাময়িক অপরাপর বাংলা লেখকের লেখা পড়লে দেখা যায় যে, এক রামমোহন রায় ব্যতীত অপর কোনো বাঙালির এ চৈতন্য হয়নি যে, নবাবের রাজ্য কোম্পানির হাতে পড়ায় শুধু রাজার বদল হল না, সেই সঙ্গে জাতীয় জীবনের মহা পরিবর্তনের সূত্রপাত হল।" (প্রবন্ধ সংগ্রহ ১, পৃ ১৮২-৮৩)।

এর থেকে রামমোহনের মনের চেহারা জানা গেল। আর তা না জানতে পারলে গদ্যলেখক রামমোহনের সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ সম্ভব নয়। রামমোহন যে

practical reason-এর ভক্ত ছিলেন, তার প্রমাণ আমরা হাতে হাতেই পাই। তিনি ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দাসবুদ্ধি থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। সেজন্য তিনি যথাক্রমে ব্রাহ্ম ধর্ম ও ইংরেজি শিক্ষার প্রচারে ব্রতী হন। ১৮২৩ খৃস্টাব্দে রামমোহন তৎকালীন বড় লাট লর্ড আমহার্স্টকে যে আবেদনমূলক পত্র লিখেছিলেন, তাতে তিনি এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন। জাতীয় মনকে সামাজিক দাসবুদ্ধি ওরফে ব্যবহারিক অবিদ্যা থেকে মুক্তি দিতে গিয়ে তিনি এদেশে য়ুরোপীয় শিক্ষাকে আবাহন করে নিয়েছিলেন। তিনি দুটি সত্যভিত্তিক য়ুরোপীয় শাস্ত্রের অনুরাগী ছিলেন—বিজ্ঞান ও ইতিহাস। "এ দুয়ের চর্চার ফলে মানুষের মন মানুষ সম্বন্ধে ও বিশ্ব সম্বন্ধে 'বড়াই বুড়ি কথা'র প্রভুত্ব হতে নিষ্কৃতি লাভ করে।...রামমোহন রায় দেশের লোককে এই সত্যমূলক য়ুরোপীয় শাস্ত্রমার্গে সাধনা করতে শিখিয়ে গিয়েছিলেন।"

(তদেব পৃঃ ১৯০)

সুতরাং রামমোহন যে গদ্যের চর্চা করেছিলেন, তা যে মূলত কেজো-গদ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বস্তুত তিনি বাংলা গদ্যকে তর্কসভার উপযোগী করে তুলেছিলেন। তাই রামমোহনের গদ্যে আবেগ স্পন্দিত হয়নি, পরন্তু তর্কসভার খটখটে লড়াই জমে উঠেছে। রামমোহনকে খৃস্টান পাদ্রি, হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলিম মোল্লাদের সঙ্গে অনবরত লড়াই করতে হয়েছে। তার ওপর তিনি ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের ও সমাজ সংস্কারের জন্য নিয়তই পুস্তিকা মারফৎ আন্দোলন চালিয়েছেন। সুতরাং তাঁকে যে-গদ্য ব্যবহার করতে হয়েছে, তা কেজো-গদ্য। এই গদ্য তিনি নির্মাণ করেছেন। তাঁর সামনে বাঁধানো ভাষাপথ ছিল না। ব্যাকরণ লিখে, বাক্য গঠন ক'রে তাঁকে এগোতে হয়েছে। রামমোহন যে এ বিষয়ে কতদূর সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ পাই এখানে: "বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। জে জে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন নামের সহিত

কোন ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন জে হেতু এক বাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থ জ্ঞান হইতে পারে না। তাহার উদাহরণ এই ব্রহ্ম জাঁহাকে সকল বেদে গান করেণ আর জাহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্ব্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন। এ উদাহরণে যদ্যপি ব্রহ্ম শব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি তত্রাপি সকলের শেষে হয়েন এই জে ক্রিয়া শব্দ তাহার সহিত ব্রহ্ম শব্দের অন্বয় হইতেছে আর মধ্যেতে গান করেন জে ক্রিয়া শব্দ আছে তাঁহার অন্বয় বেদ শব্দের সহিত আর চলিতেছে এ ক্রিয়া শব্দের সহিত নির্ব্বাহ শব্দের অন্বয় হয়। অর্থাৎ করিয়া জেখানে জেখানে বিবরণ আছে সেই বিবরণকে পর পূর্ব্বপদের সহিত অন্বিত জেন না করেণ এই অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থ বোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না।" ('বেদান্তগ্রন্থ', পৃ ১৩-১৪ [১৮১৫])

এই জন্যই রামমোহনকে বলি গদ্য স্রষ্টা (Maker of prose)।

রামমোহনের বাংলা রচনা যা পাওয়া গিয়েছে, তা হল : উপনিষদের বাংলা গদ্যানুবাদ (১৮১৬—১৯), বেদান্তগ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্তসার (১৮১৫), ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার (১৮১৭), গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮২৬), পথ্যপ্রদান (১৮২৩)। তা ছাড়া 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১) ও 'সম্বাদকৌমুদী' (১৮২৯) পত্রিকায় তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। সমসাময়িক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গোষ্ঠীর লেখকদের থেকে রামমোহন বেশি সচেতন গদ্যশিল্পী ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর গৌড়ীয় ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণে তিনি বাংলা বাক্যের পদবিন্যাসরীতি (syntax) সম্পর্কে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা থেকে সচেতন শিল্পীমনের পরিচয় পাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাদ্রি ও পণ্ডিতদের হাতে বাংলা গদ্য ছিল প্রাণহীন ও আড়ষ্ট। এই গদ্যের বহু-বিসর্পিত, অনিয়ন্ত্রিত বিস্তার, বিশৃঙ্খল পদবিন্যাসপ্রণালী (syntax) গদ্যচর্চার মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দিয়েছিল। আর পূর্ববর্তী গদ্য-নিদর্শন যা ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন-সম্পাদিত 'প্রাচীন বাংলা পত্র-সংকলনে' পাই তা সতেরো আঠারো শতকের

বাংলা গদ্য। তাতে আরবী পারশী শব্দের প্রাচুর্য, বাক্যের অন্তর্গত পদনিচয়ের অন্বয়ে অমার্জনীয় শৈথিল্য ও বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায়। রামমোহনের হাতে এই বিশৃঙ্খল পদগুলির (parts of speech) মধ্যে একটি অনতি-লক্ষ্য সামঞ্জস্য স্থাপিত হল, বিরামচিহ্নের প্রয়োগ দেখা দিল, দেশি-বিদেশি সংস্কৃত শব্দের অদ্ভুত মিশ্রণ রহিত হল, সংস্কৃত পদবিন্যাসরীতি (syntax) বর্জিত হল এবং বাংলা ভাষার প্রকৃতির উপযোগী পদবিন্যাসরীতি দেখা দিল। সংস্কৃত গদ্যের ওপর একান্ত নির্ভরতা যে বাংলা গদ্যের বিকাশের পথে প্রধান বাধা, এটি রামমোহন বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি নোতুন পথে এগোলেন এবং বাংলা গদ্যের পঠন-পাঠন সম্পর্কে পাঠকদের নির্দেশ পর্যন্ত দিলেন।

ফলে বাংলা গদ্যের ভারবহন-ক্ষমতা বেড়ে গেল। জটিল শাস্ত্রতর্ককে বহন করার ক্ষমতা এই কেজো-গদ্যে দেখা গেল। বাদানুবাদের উপযোগী ঋজুতা, কাঠিন্য, সবলতা ও প্রাঞ্জলতা এই গদ্যের প্রধান লক্ষণ। বস্তুত এ না হলে রামমোহনের চলে না, বিভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে নিয়তই যাঁকে লড়াই করতে হচ্ছে, তাঁর পক্ষে ভারবহনপটু গদ্য অত্যাবশ্যক। বাংলা গদ্য এখন দৃঢবদ্ধ ও সংহত হল, এখন আর সে টলটলায়মান নয়, প্রতি পদক্ষেপে আগের মতো আর বিশৃঙ্খল পদবিন্যাসের কোঁচায় পা আটকে আছাড় খেতে হয় না। সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের লাঠি ধরে চলার অসহায়তা থেকে বাংলা গদ্য মুক্তি পেল। তাই রামমোহনকে গদ্যনির্মাতা বলতে পারি।

কিন্তু রামমোহনের কৃতিত্ব এই পর্যন্ত। তাঁর গদ্য সাহিত্যিক সুষমা লাভ করেনি, তাতে হৃদয় বেদনা কোনদিন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেনি। এই গদ্যে কেবল তর্ক সভায় যুদ্ধ জেতা যায়। বাংলা গদ্যরাজ্যে রামমোহন দেখা দিয়েছিলেন যোদ্ধবেশে। তাঁর আয়ুধ ছিল শাস্ত্রোক্ত প্রমাণনিচয়। তূণে ছিল ব্যংগের সুতীক্ষ্ণবাণ। এই সুতীক্ষ্ণ বাণে তিনি প্রতিপক্ষকে বিধ্বস্ত করে ফেলতেন। এই ব্যাপারে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রবর্তী।

এইবার রামমোহনের গদ্যের খানিকটে নিদর্শন দিচ্ছি। এই উদ্ধৃতি থেকে রামমোহনের সত্যভিত্তিক যুক্তি বিস্তার কৌশল ও ভদ্র অথচ সাংঘাতিক

বিদ্রূপ-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাবে। এটি 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকা (১৮২১) থেকে গৃহীত হয়েছে:

"শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারও ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা। পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনারি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ ও অন্যান্য ধর্ম্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রীষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যপিও যিশু খ্রীষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্ম্মের ঔৎকর্ষের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে সে সকল দেশে তাঁহাদের অধিকারে ছিল না সেইরূপ মিসনরিরা ইংরেজের অধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নামে মাত্র লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা

দুর্ব্বলের মনঃপীড়াতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন তাহাতে যদি সেই দুর্ব্বল তাঁহাদের অধীন হয় তবে তাহার মর্ম্মান্তিক কোনমতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা, ত্যাগকে ধর্ম্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্ব্বপ্রকারে অনৈক্যতার মুল হয়। লোকের স্বভাবসিদ্ধ প্রায় এই যে যখন একদেশীয় লোক অন্য দেশকে আক্রমণ করে সেই প্রবলের ধর্ম্ম যদ্যপিও হাস্যাস্পদ স্বরূপ হয় তথাপি ঐ দুর্ব্বল দেশীয়ের ধর্ম্ম ও ব্যবহারের উপহাস ও তুচ্ছতা করিয়া থাকে।"

এই গদ্যের সাবলীলতা ও বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা আমরা সহজেই অনুধাবন করিতে পারি। রামমোহনের গদ্য, এক কথায় আজন্ম বিদ্রোহী রামমোহনের পরিচায়ক। এই রচনাভঙ্গিতে একটি আত্মশক্তিতে ও আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ নির্ভীক গম্ভীর ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই। এই ব্যক্তিত্বই ভারতপথিক রামমোহন রায়। রবীন্দ্রনাথের কথায় এই বলে শেষ করি, "রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট-স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জনদশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন।"

তাই গদ্যনির্মাতা রামমোহনের নাম গদ্যেতিহাসে অবশ্যস্বীকার্য।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা গদ্যকে যাঁরা গড়ে-পিটে দাঁড় করিয়েছেন, তাঁরা সকলেই মুখ্যত সাহিত্যসেবী নন। জীবনে আর পাঁচটা কাজের সঙ্গে সাহিত্যেরও সেবা করেছেন। ঐ সময়ে যাঁরা বাঙালি হিন্দু সমাজের সংস্কার সাধনে এগিয়েছিলেন ও যাঁরা বাধা দিয়েছিলেন, উভয় পক্ষই সাময়িক পত্রিকা ও পুস্তিকা-মাধ্যমে তাঁদের মতামত প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এই মন্তব্য গত শতকের প্রথমার্ধে অনেক সমাজনেতার সম্পর্কেই করা চলে। রামমোহন রায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—'সাহিত্যসেবী' এঁদের একমাত্র পরিচয় নয়। হিন্দু সমাজের রক্ষায় ও ভাঙায়, সংস্কারে ও গঠনে এঁরা কোনো-না-কোনো পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। এই সংঘর্ষে কোনো পক্ষ হেরেছেন, কোনো পক্ষ জিতেছেন। কিন্তু লাভবান হয়েছে বাংলা গদ্য। তর্কের ভাষা, যুক্তির ভাষা, রসের ভাষা, গুরু চিন্তার ভাষা, লঘু ব্যঙ্গের ভাষা হিসেবে বাংলা গদ্য গড়ে উঠেছে। তাই গত শতকের প্রথমার্ধে সমাজান্দোলন ও সংঘর্ষের ইতিহাস পরোক্ষে বাংলা গদ্যেরও ইতিহাস।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে প্রমথনাথ শর্ম্মা (১৭৮৭—১৮৪৮) এই শ্রেণীর সাহিত্যসেবী ও গদ্যলেখক ছিলেন। বাংলা গদ্যেতিহাসে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামমোহন রায়ের পরই তাঁর নাম পাই। মৃত্যুঞ্জয় বাংলা গদ্যের প্রথম সচেতন কলাকার, আর রামমোহন সেদিনের আড়ষ্ট বাংলা গদ্যকে তর্কসভার উপযোগী ঋজুতা ও গতিবেগ দান করেন। তখনো বিদ্যাসাগর আসেননি। সেই সময়ে—শাস্ত্রীয় বিচার ও সমাজ সংস্কার নিয়ে মাথা ফাটাফাটির সময়ে—বাংলা গদ্যে তিনি লালিত্য ও রস সঞ্চার করেন। ঈশ্বর গুপ্ত-গৌরীশংকর তর্কবাগীশ-হুতোম-আলালের হাতে যে ব্যংগপ্রধান বিদ্রূপাত্মক শাণিত তীক্ষ্ণধার গদ্য গড়ে উঠেছিল, তার পত্তন হয় ভবানীচরণের হাতে। প্রাক্-বিদ্যাসাগর-যুগে বাংলা গদ্যে রসসঞ্চারের মহৎ গৌরব তিনিই দাবি করতে পারেন।

ভবানীচরণের গদ্যরচনাকাল ১৮২১-১৮৪৮। ভবানীচরণ সেদিনের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের নেতা ছিলেন। 'ইয়ং বেঙ্গলের' সঙ্গে তিনি এইজন্য মসীযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, ১৮৩০-এ ধর্মসভা স্থাপন করেন, 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১) ও 'সমাচারচন্দ্রিকা' (১৮২২) পত্রিকায় সনাতন হিন্দুধর্মের পক্ষ নিয়ে লেখনী চালান। ভাগবত, মনুসংহিতা, গীতা, ঊনবিংশ সংহিতা ও স্মার্ত রঘুনন্দন-কৃত তত্ত্বনব্যস্মৃতি পুঁথি আকারে মুদ্রণ করে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারকল্পে তিনি বিতরণ করেন। এই সংক্ষিপ্ত জীবনকথা থেকেই বোঝা যায় তিনি অক্লান্তকর্মা সমাজনেতা ছিলেন।

এই কর্মী পুরুষের জীবনের একটি মাত্র দিক: গদ্যলেখক। সনাতন ধর্মের জয়ঘোষণা ও হিন্দুধর্মরক্ষা প্রয়াসেরই অপর দিক তাঁর গদ্যচর্চা। যে তিনটি গ্রন্থের জন্য তাঁর খ্যাতি, সেগুলি ব্যঙ্গপ্রধান, আচারভ্রষ্ট নীতিভ্রষ্ট হিন্দুদের শিক্ষাদানচ্ছলে রচিত: (১) কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩), (২) নববাবুবিলাস (১৮২৫), (৩) নববিবিবিলাস (১৮৩১)। এই তিন গ্রন্থের সাহিত্যমূল্যবিচার এখানে অভিপ্রেত নয়; বিচার্য এই, প্রাক্-বিদ্যাসাগর পূর্বে বাংলা গদ্যে লঘুতা ও ক্ষিপ্রচারিতা আনায়, ব্যঙ্গরস ও বিদ্রূপ প্রয়োগে এগুলির সার্থকতা। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার-প্রদর্শিত পথ ভবানীচরণ অগ্রাহ্য করেছিলেন, আবার রামমোহনের নীরস খটখটে তর্কের ভাষাকেও আদর্শ বলে মানেন নি। তিনি সেই গদ্যই তৈরি করেছিলেন যা ব্যঙ্গে উজ্জ্বল, বিদ্রূপে তীক্ষ্ণধার, রসে পূর্ণ, গতিতে স্বচ্ছন্দ ও ক্ষিপ্রচারী। ব্যঙ্গপ্রধান গদ্যের তিনিই প্রথম শিল্পী।

গদ্যশিল্পী ভবানীচরণের এবার কিছু পরিচয় গ্রহণ করা যাক্।

'কলিকাতা কমলালয়':

"দেখ এ স্থানে যে সকল লোক দুর্গোৎসব করেন তাহাকে ঝাড় উৎসব, বাতি উৎসব, কবি উৎসব, বাই উৎসব, কিম্বা স্ত্রীর গহনা উৎসব, ও বস্ত্রোৎসব বলিলেও বলা যায় ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া থাকেন।" (পৃ ১১)

"ন, উ, শুন যাহারা বাবুর মোসাহেব রূপে খ্যাত হয় তাহাদিগের বিষয় তোমাকে কি বলিব আমার বোধ হয় বুঝি ঐ নরাধমেরদিগের ইহকালও নাই পরকালও নাই, তবে দিনপাতের বিষয়, তাহা বাবুর প্রসাদে আপন ২ উদর পূরণ

হয়, যদি তাহার পরিবার থাকে তবে তাহারদিগের পরমেশ্বর দিন চালাইবেন ইহাই ভাবে, আর কখন ২ বাবু কিছু ২ দিয়া থাকেন তাহা বুঝি কেহ ২ পরিবারেরদিগকে দেয়, প্রায় অনেকেই তাহারদিগের ইহকাল নিস্তারকর্ত্রীকেহ দিয়া থাকে বাটির পরিবারেরা কোন উপায় করিয়া লয়।” (পৃ ৮৯-৯০)

'নববাবুবিলাস' ঃ

“অমাত্যবর্গরা কহিলেন বাবুরদিগের যেরূপ বুদ্ধি ও মেধা এরূপ প্রায় দৃষ্টচর নহে আমরা পাঠশালায় দেখিয়াছি অঙ্কের সঙ্কেত দেখাইবা মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং শ্রবণ মাত্রেই শ্লোক অভ্যাস করেন ইঁহারা মহাশয়ের নাম সম্ভ্রম ও কুলোজ্জ্বল করিবেন আর কহিলেন বাঙ্গালা লেখাপড়া এক প্রকার হইয়াছে আর যদি কিছু অপেক্ষা থাকে তাহাও হইয়া উঠিবেক আপনারদিগের জাতি বিদ্যা আর এমনি এ বংশের গুণ আছে না পড়িলেও বিদ্যা হয় সংপ্রতি এই অবধি পারসী পড়াইলে ভাল হয়। কর্ত্তা কহিলেন আমিও মনে মনে স্থির করিয়াছি যে এক বেলা বাঙ্গালা এক বেলা পারসী পড়াইলে ভাল হয় অমাত্যেরা কহিলেন উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন ইত্যাদি অনেক খোসামোদের কথা কহিতে লাগিলেন।”

'নববিবিবিলাস' ঃ

“যদ্যপি নববাবুবিলাসে নব বাবুদিগের স্বভাব সুপ্রকাশ আছে, কিন্তু সে গ্রন্থের ফল খণ্ডে লিখিত ফলের প্রধান মূল বাবুদিগের বিবি, সেই বিবিরূপ প্রধান মূলের অঙ্কুরাবধি শেষ ফল তাহাতে সবিশেষ ব্যক্ত হয় নাই ; এ নিমিত্তে তৎপ্রকাশে, প্রয়াসপূর্ব্বক নববিবিবিলাস নামক এই গ্রন্থ রচনা করিলাম।” (পৃ ৩)

এই গদ্যের অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গপ্রবণতা, সংসতা ও পরিহাসকুশলতা পাঠমাত্রেই ধরা পড়ে। দুরান্বয়ের শৈথিল্য ও সংস্কৃতবহুল সমাস-পটলের দৌরাত্ম্য থেকে এই গদ্য মুক্ত। বিরতিচিহ্নের বিরলতাই এই গদ্যের একমাত্র ত্রুটি যার সংশোধন হয় বিদ্যাসাগরে। এই গদ্যের ক্ষিপ্রচারিতা ও সাবলীলতা প্রাক্-বিদ্যাসাগর যুগের গদ্যে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। এখানেই গদ্যশিল্পী ভবানী-চরণের সার্থকতা। ভবানীচরণ সমাজসংস্কারে গোঁড়া রক্ষণশীল, কিন্তু গদ্যচর্চায় প্রগতিশীল। এইজন্যই সতীদাহ-সমর্থক সংস্কারবিরোধী ভবানীচরণকে আমরা মনে রাখব।

কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি ও শ্রীমতী মুলেন্স

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনায় আমরা সাধারণত যে সকল গ্রন্থ ও গদ্যলেখকের কথা আলোচনা করি, তাতে মাঝে মাঝে বড় বড় ফাঁক থেকে যায়। অথচ এই ফাঁক ভরাবার কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই। রামমোহন-মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পর কয়েক বছর উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনাময় গদ্যশিল্পীর দেখা নেই, একেবারে বিদ্যাসাগর-অক্ষয় দত্ত-দেবেন্দ্রনাথে পৌছতে হয়। বিদ্যাসাগর ও সংস্কৃত কলেজ লেখকগোষ্ঠীর পরই বঙ্কিমচন্দ্রে পৌছই। মাঝে মাত্র পাঁচটি নাম পাই : রামগতি ন্যায়রত্ন, তারাশংকর তর্করত্ন, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, প্যারীচাদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ। কিন্তু 'আলালী' ও 'হুতোমী' ভাষার কোনো পূর্বাভাস পাই না। এই দুটি ফাঁক থাকার অর্থ হল বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক বিবর্তনের পথে কয়েকটি 'মাইল পোস্টে'র অবলুপ্তি।

সুখের বিষয় সম্প্রতি দু'টি গ্রন্থের পুনরুদ্ধার হয়েছে—যার দ্বারা এই দুটি ফাঁক ভরিয়ে দেওয়া যায় এবং বাংলা গদ্যের (সাধু ও চলিত রূপের) বিবর্তনের ইতিহাস অচ্ছেদ্যপরম্পরা সূত্রে হাতে পাই। গ্রন্থ দুটির নাম : কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি-রচিত "পুরাণ-বোধোদ্দীপনী" (রচনাকাল ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ) ও শ্রীমতী মুলেন্স রচিত "ফুলমণি ও করুণা" (রচনাকাল ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ)। প্রথমোক্ত গ্রন্থের আবিষ্কর্তা গৌহাটির অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, দ্বিতীয়টির জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। উভয়ের নিকট বাংলা গদ্যেতিহাসের সকল ছাত্রই কৃতজ্ঞ। এঁরা অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

প্রথম গ্রন্থ "পুরাণ-বোধোদ্দীপনী" (১৮২৭) বিদ্যাসাগরের কৃতিত্বের দাবীদার। এতদিন আমাদের ধারণা ছিল বাংলা গদ্যের অপটু রচনারীতি প্রথম বিদ্যাসাগরের হাতেই বহিঃসৌষ্ঠব ও অন্তঃসামঞ্জস্য লাভ ক'রে সাহিত্যিক মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য। তথাপি কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণির কৃতি অনুপেক্ষণীয়। প্রথম যুগের গদ্যলেখকবৃন্দ ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে

ব্যবধান ছিল, তা এই গ্রন্থের পুনঃপ্রচারে সংকীর্ণতর হয়েছে। ১৮৪৭ এ প্রকাশিত "বেতালপঞ্চবিংশতি" গ্রন্থে বিদ্যাসাগর যে সুষম ললিত সুশৃঙ্খল বিরামচিহ্নযুক্ত সাহিত্যিক গদ্যের সার্থক চর্চা করলেন, "পুরাণ-বোধোদ্দীপনী"তে কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি তারই ভূমিকা করেছেন। এই গ্রন্থের বাক্যবিন্যাসকৌশল ও ভারসাম্যবিধানের পটুতা বিদ্যাসাগরের "বেতালপঞ্চবিংশতি", "শকুন্তলা" ও "সীতার বনবাস" গ্রন্থের পূর্বাভাসরূপে বিবেচিত হবার যোগ্য। কৃষ্ণচন্দ্রের গদ্যের এই বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যস্বীকার্য ঃ বাক্যের পরিধি-সংকোচ ও প্রকাশ ভঙ্গির সুস্পষ্টতার দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা, আশ্রিত বাক্যাংশের (dependent clauses) সংখ্যা হ্রাস ও সমগ্রতার মধ্যে তাদের যথাযথ স্থাননির্দেশ, ভারসাম্য-বিধান ও বাক্যের সামগ্রিক ঐক্য রক্ষা। সমস্তটা মিলিয়ে এই ধারণাই জন্মে যে, রচনারীতির পরিচ্ছন্নতা ও শিল্পসুষমাবোধের উপরেই কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণির গদ্যের প্রতিষ্ঠা।

তবে বিদ্যাসাগরের গদ্যে যে শিল্পবোধ ও সাহিত্যিক সুষমা লক্ষ্য করা যায়, তা কৃষ্ণচন্দ্রের গদ্যে অনতিস্পষ্ট ছিল। বাংলা গদ্যের প্রকৃতি অনুধাবনে বিদ্যাসাগর যে দুর্লভ ক্ষমতায় পরিচয় দিয়েছেন, তা কৃষ্ণচন্দ্রের ছিল না। শ্বাস-পর্বানুসারে বাক্যাংশের ব্যবহার ও সেগুলিকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও অর্থ সাপেক্ষ করে তোলা এবং অর্থানুসারে বিরামচিহ্নের সুপ্রচুর প্রয়োগ বিদ্যাসাগরই প্রথম করেন। কৃষ্ণচন্দ্রে যার আভাষ, বিদ্যাসাগরে তার প্রতিষ্ঠা। তাই বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ না করেই আমরা কৃষ্ণচন্দ্রের গদ্যরচনাকে গ্রহণ করতে পারি।

এখন কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণির রচনারীতির কিছু প্রত্যক্ষ পরিচয় গ্রহণ করা যাক্। এই গ্রন্থের শেষে শিরোমণি মশায় অশেষ বিনয় সহকারে বলেছেন ঃ

"ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণ অন্তর্গত তিনখণ্ড গৌড়ীয় ভাষায় পুরাণবোধোদ্দীপনী নামে প্রকাশিত হইয়াছে সে গ্রন্থের সহায়ক আমি ছিলাম সমাপন সমুদয় না হওনে আপন নাম লিখি নাই এক্ষণ অবশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড সমুদয় আমার শ্রমে সমাপন হইল ইহার নাম পূর্ব্ববিধান মতে পুরাণবোধোদ্দীপনী চতুর্থ খণ্ড রাখা গেল অধ্যায় বিজ্ঞগণের গোচর জন্য বিশেষ নিবেদন এই যদিস্যাৎ মদীয় লিবি

ভাষায় রচিত বিধায় পণ্ডিতদিগের প্রিয় না হয় তথাচ ভরসা করি যে শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম উৎপত্তি স্থিতি লয়ের কারণ তাঁহার লীলা-বর্ণন এ গ্রন্থে প্রচুর ইহা শ্রবণ অবলোকন ও মননে অবশ্য পরমহিতসূচক"।

বিরামচিহ্ন না থাকা সত্ত্বেও এই গদ্যের সাবলীল গতি সহজেই অনুধাবন করা যায়।

দ্বিতীয় গ্রন্থ "ফুলমণি ও করুণা" প্যারীচাঁদের কৃতিত্বের দাবীদার। এই গ্রন্থের লেখিকা শ্রীমতী হান্না মুলেন্স। "আলালের ঘরের দুলাল" (১৮৫৮) গ্রন্থের ছয় বৎসর পূর্বে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। "ফুলমণি ও করুণা" বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাস্তববাদী কাহিনী। শ্রীমতী মুলেন্স নেটিব খ্রীশ্চান "স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে" এই গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস রূপে এ গ্রন্থের দাবী অবশ্যস্বীকার্য, কিন্তু তা আমার আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থের গুরুত্ব সমধিক। আবিষ্কর্তার মতে, এ গ্রন্থ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য লিখিত ও প্রকাশিত হয় বলেই পরবর্তীকালে উপেক্ষিত হয়েছে। কিন্তু গদ্যেতিহাসের ছাত্ররা এই গ্রন্থকে উপেক্ষা করতে পারেন না।

এই গ্রন্থের রচয়িত্রী য়ুরোপীয় মহিলা। তিনি পাদ্রী লাক্রোয়ার কন্যা। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় তাঁর জন্ম হয়। তিনি লণ্ডন মিশনের কর্মী মুলেন্স সাহেবকে বিবাহ করেন ও স্বামীর সঙ্গে এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এখানেই ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান। তিনি বাংলা অনর্গল বলতে পারতেন। কলকাতা ও মফঃস্বলের বাঙ্গালিদের সংগে মিশে তিনি এই ক্ষমতা অর্জন করেন। (এই বিবরণী শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ থেকে গৃহীত—'দেশ' শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬৩)।

শ্রীমতী মুলেন্সের গদ্য সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ; বিদ্যাসাগর ও প্যারীচাঁদ মিত্রের ভাষাদর্শের পাশে রেখে এই গদ্য পড়লে শ্রীমতী মুলেন্সের কৃতিত্ব পরিমাপ করা সম্ভব। গল্পচ্ছলে লেখিকা মফঃস্বলের বাংলার জীবনচিত্র এঁকেছেন। লেখিকা আরবী, ফারসী ও গ্রাম্যশব্দ এই গ্রন্থে ব্যবহার করেন নি। এই গ্রন্থের সংলাপ

এতো হৃদয়গ্রাহী ও স্বচ্ছন্দ যে, মনে হয় না এই গ্রন্থ কোনো ধর্ম প্রচারের জন্য লিখিত। বিরতিচিহ্নের সুষ্ঠু ব্যবহার লেখিকা করেছেন। বাক্যগুলি অনতিদীর্ঘ; সমাস-জটিলতা ও শব্দাড়ম্বর এ গ্রন্থে অনুপস্থিত। সর্বোপরি রচনারীতিতে সাহিত্যিক সুষমা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

এবার "ফুলমণি ও করুণা"র বিবরণ থেকে খানিকটা তুলে দিই, তাহলেই শ্রীমতী হান্না মুলেন্সের কৃতিত্ব সুপ্রমাণিত হবে।

নবীন নামে একটি গ্রাম্য কিশোরের বর্ণনা ঃ

"....গৃহের ভিতরে দৌড়াইয়া আইল। তাহার বর্ণ অতিশয় কাল, এবং ধূলা ও কাদাতে খেলা করিয়া আসিয়াছিল, এই জন্য তাহাকে আরও মলিন বোধ হইল। সে প্রায় উলঙ্গ, কেবল তাহার কোমরে একখানি ছেঁড়া কানি বাঁধা ছিল।"

স্বচ্ছন্দ সংলাপের উদাহরণ ঃ

"আমার আগমনের শব্দ শুনিয়া একজন অর্দ্ধবয়স্কা স্ত্রীলোক বাহিরে আইল। তাহার মাথার চুল সুন্দররূপে বাঁধা ও তাহার পরিধেয় শাড়ি অতিশয পবিষ্কার ছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওগো এটা কি তোমাব পাখী? কাকসকল উহাকে বড় দুঃখ দিতেছিল, এজন্য আমি উহাকে বাটির ভিতরে আনিয়াছি। স্ত্রীলোক উত্তর করিল, বিবিসাহেব, আপনকার বড় অনুগ্রহ। এ আমার পাখী বটে, আমার পুত্র ভুলিযা বাহিরে ফেলিয়া গিয়াছে। ইহা বলিয়া সে পক্ষীর সকল এলোমেলো পালকগুলিতে হাত বুলাইয়া সমান করিল এবং বোধ হইল যে, পক্ষী তাহার কর্ত্রীকে ভালরূপে চিনিত; কাবণ সে তাহাকে না কামড়াইয়া বস্ত্রের মধ্যে লুকাইতে চেষ্টা কবিল।"

এই স্ত্রীলোকই গল্পের নায়িকা ফুলমণি। তারপর ফুলমণির বাড়ীর বর্ণনা জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ। এই বর্ণনায় যে অনায়াস-স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করা যায়, তাতে

মনে হয় না এই গ্রন্থ একশ বৎসর পূর্বের লেখা। সাম্প্রতিক গদ্যরীতির যে সাবলীলতা, তার খানিকটা এই বর্ণনাতে পাই। শ্রীমতী মুলেন্স ছোট ছোট বাক্য দিয়ে ফুলমণির বাড়িটি এঁকেছেন ঃ

"তাহার চতুর্দিগের বেড়া নূতন দরমা ও নূতন বাঁশ দিয়া বাঁধা ছিল, এবং তদুপরি একটি সুন্দর ঝিঙালতা উঠিয়াছিল। উঠানের এক পার্শ্বে গোরুর একখানি ঘর দেখা গেল, তাহার মধ্যে একটি গাভী ও বৎস ধীরে ধীরে জাওনা খাইতেছে। গোশালার ছাতের উপরে অনেক পাকা লাউ দেখিলাম। উঠানের অন্যদিকে পাকশালা ছিল এবং তাহার দ্বার খোলা থাকাতে আমি দেখিতে পাইলাম তন্মধ্যে তিন চারিটি সুমার্জিত থালা ও ঘটি এবং কএকখানি পরিষ্কার পাথরও রাশীকৃত আছে। উঠান সুন্দররূপে পরিষ্কৃত ছিল, তাহাতে যেমন প্রায় সকল ঘবে রীতি আছে তেমন কোন কোণে জঞ্জালের রাশি দেখিতে পাইলাম না; সকল সমান পরিষ্কার ছিল। দাবার সম্মুখে ঘরেব ছাঁচির নীচে দশ বারটি চারাগাছ গামলাতে সাজান দেখিলাম; তাহার মধ্যে তিন চারটি ঔষধের গাছ ছিল, অন্য সকল গ্যাঁদা, তুলসী, গন্ধরাজ ইত্যাদি। একটি অতি সুন্দব চীন গোলাপের চারাও ছিল, তাহাতে কুঁড়ি ও ফুল ধরিয়াছিল।"

একশ বৎসর পেরিয়ে এসেও এই বর্ণনা জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ হয়ে আছে। অনাবশ্যক গ্রাম্যতা ও দুর্দান্ত পাণ্ডিত্য—উভয় দোষ থেকে মুক্ত সহজ সাবলীল রচনা-রীতিই এই বর্ণনার প্রাণ। গদ্যলেখিকা হিসেবে শ্রীমতী মুলেন্সের কৃতিত্ব তাই অবশ্যস্বীকার্য।

কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণির "পুরাণ-বোধোদ্দীপনী" (১৮২৭) ও শ্রীমতী মুলেন্সেব "ফুলমণি ও করুণা" (১৮৫২)—গ্রন্থদু'টি বাংলা গদ্যেতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাই এ দুটিকে বাদ দিলে বাংলা গদ্যের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২৯—১৮৯০) বাংলা গদ্যের প্রথম সাহিত্য-শিল্পী। তাঁর আগে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি বাংলা গদ্যকে ঘষে-মেজে দাঁড় করান। বিদ্যাসাগর সে গদ্যে কেবল রক্তমাংস মজ্জা যোগ করে প্রাণ দান করে ক্ষান্ত হন নি, সাহিত্যিক সুষমা ও লাবণ্য সঞ্চার করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠীর পণ্ডিতবর্গ ও সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকবর্গ গত শতকের প্রথমার্ধে যে বাংলা গদ্যের চর্চা করেছিলেন, তা সাহিত্যের বাহন হয়ে ওঠে নি, কেজো ভাষা ছিল। বিদ্যাসাগর এই কেজো ভাষাকে সাহিত্যপদবাচ্য করে তোলেন। তাই তিনিই বাংলা গদ্যের প্রথম সাহিত্য-শিল্পী। গদ্যলেখার 'স্টাইল' তিনিই প্রথম প্রবর্তিত করেন।

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের সচেতন শিল্পী এই অর্থে যে তিনি বাংলা সাধু গদ্যের কাঠামো কি হওয়া উচিত তা ঠিক করেন এবং চলতি গদ্যের সম্ভাবনা কতটা আছে তা নিয়ে পরীক্ষা চালান। বেনামীতে তিনি যে বইগুলি লেখেন তাতে তিনি দেশী-বিদেশী শব্দ প্রচুর ব্যবহার করেছেন। বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চরিত্র ; তাঁর চরিত্রে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় জাতির যাবতীয় গুণের প্রকাশ ঘটেছিল। বিদ্যাসাগরের রচনাতেও তাই হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের অতিশয় পেলব ও মার্জিত, শুদ্ধ ও সংযত রসনৈপুণ্যের সঙ্গে আধুনিক মনোবৃত্তি অনুযায়ী যুক্তিনিষ্ঠা ও পরিমাণবোধ, স্বাভাবিকতা ও সাবলীলতা ঃ এই দুয়ের মিলন ঘটেছে বিদ্যাসাগরী স্টাইলে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কান ও প্রাণের যে সাধনায় অমিতাক্ষর ছন্দ আবিষ্কার করেছিলেন, বিদ্যাসাগর সে সাধনায় বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত ছন্দ ও গতিবেগ আবিষ্কার করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের ধ্বনি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সচেতন হন। তিনি তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত ছন্দ, ঝঙ্কার ও গতিবেগ আবিষ্কার করেন। আজ থেকে একশ'দশ বছর আগে যখন বাংলা গদ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক চিন্তার কোনো সুযোগ ছিল না, তখন

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের প্রকৃতিকে খুঁজে বার করেন। বাংলা ভাষায় একটি বাক্য কয়েকটি বাক্যাংশের সমষ্টি মাত্র, আবার এই বাক্যাংশগুলিকে শ্বাস-পর্ব (Breath-group) বা সার্থ-পর্ব (Sense-group)-রূপে চিহ্নিত করা যায়, তা বিদ্যাসাগরই প্রথম দেখান। তিনি দেখান যে, প্রত্যেক শ্বাস-পর্ব বা সার্থ-পর্ব, বাক্যের পৃথক অঙ্গরূপে, সাধারণ আদ্যক্ষরে স্বরাঘাত-যুক্ত হয় (stress on first syllable) এবং পর্বের অন্ত শব্দের স্বরাঘাত বিলুপ্ত হয়। বাংলা ছন্দেরও একই কথা। অনন্যসাধারণ ধ্বনি ও ছন্দ বিচার-শক্তি দ্বারা বিদ্যাসাগর এই মূল রহস্যটিকে আয়ত্ত করেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠির পণ্ডিতবর্গ যে ফরমায়েসি পাঠ্যপুস্তক রচনা করত, তা প্রাণহীন আড়ষ্ট গদ্য রচনা। তাঁদের সামনে কোনো আদর্শ (model) ছিল না, অতীতের কোনো নিদর্শন ছিল না, তাঁদের নিজস্ব কথা কিছু ছিল না, কোনো অন্তরুদ্ধ সঞ্চিত আবেগ প্রকাশব্যাকুলতায় তাঁদেরকে অস্থির ও চঞ্চল করে তোলে নি। সমাজে ও সাহিত্যের এক বিশৃঙ্খল লগ্নে তাঁরা বাংলাসাহিত্যের এক নোতুন অজানা রাজ্যে (গদ্যরাজ্যে) পদার্পণ করলেন। আঠারো শতক পর্যন্ত যে অনুবাদকর্ম বাংলা সাহিত্যে হয়েছিল, তা সবই পদ্যে,—পয়ার ও ত্রিপদীর ধীর মন্থরগতি ছন্দে তা বিধৃত। এই নোতুন পথে—বাংলা গদ্যপথে—অনভ্যস্ত লেখকরা পৌরাণিক পদ্যানুবাদের লাঠি হাতে করে চলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু বহু-বিসর্পিত, অনিয়ন্ত্রিত-বিস্তার সংস্কৃতানুগ বাক্যগঠন রীতির লম্বা কোঁচায় পা আটকিয়ে বারে বারে আছাড় খেলেন। তাঁদের রচনারীতির মধ্যে অপটু শব্দ নির্বাচন, ভারসাম্যচ্যুত বাক্যবিন্যাস এবং অনভ্যস্ত রচনাভঙ্গীর মাধ্যমে দুর্গমপথযাত্রীর গলদ্‌ঘর্মসচেষ্টতাই প্রকটিত হয়েছে। পদ্যানুবাদের সাবলীল সোৎসাহ প্রথানুবর্তন গদ্যানুবাদের অন্তঃপ্রেরণার সমর্থনহীন আড়ষ্ট গতিভঙ্গীতে পর্যবসিত হয়েছে। (দ্রঃ—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের কথা')। ১৮০০ থেকে ১৮২৫—এই পঁচিশ বছরের বাংলা গদ্যগ্রন্থের তালিকা এই বিফলতার পরিচায়ক। রামমোহন রায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি—বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী এই তিন লেখক বাংলা গদ্যকে ভারবহনপটু, দুরূহ-চিন্তা-প্রকাশক্ষম, ও বাক্যবিন্যাসসমৃদ্ধ

করে তোলেন। বিদ্যাসাগরের হাতে এই বাংলা গদ্য বহিঃসৌষ্ঠব এবং অন্তঃসামঞ্জস্য লাভ করে' সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছে।

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সুষম, সাবলীল, ললিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ সাহিত্য-গদ্যে পরিণত করে তোলেন। এ নিয়ে তিনি অনেক ভেবেছিলেন তার প্রমাণ, বিদ্যাসাগর-রচিত গ্রন্থসমূহের সংস্করণগুলি। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে বিরাম-চিহ্নের বহুল প্রয়োগ, সম্বোধনপদের পরিবর্তন, ক্রিয়ারূপের সরলতা ও syntax-এর পরিবর্তনে গদ্যশিল্পীসুলভ সচেতনতার পরিচয় বিদ্যাসাগর দিয়েছেন। সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় ডঃ চট্টোপাধ্যায় এবং "বাংলা সাহিত্য গদ্য" গ্রন্থে ডঃ সুকুমার সেন এ বিষয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা করেছেন। কৌতূহলী পাঠক তা দেখে নিতে পারেন ; বিদ্যাসাগর অধীন বাক্যাংশগুলির (dependent clauses) সংখ্যা হ্রাস করেন, সুদীর্ঘ সমাসের ব্যবহার কমিয়ে ফেলেন, শ্বাস-পর্বানুসারে বাক্যাংশ ব্যবহার করেন, বাক্যাংশগুলির পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও অর্থসাপেক্ষ (periodic & balanced structure of sentence) রূপে ব্যবহার করেন, অর্থানুসারে কমা, ড্যাশ, সেমিকোলন প্রভৃতি বিরামচিহ্ন প্রয়োগ করেন, প্রত্যক্ষ উক্তির (direct speech) ব্যবহারে তদ্ভব ক্রিয়াপদ ও গদ্যের সাবলীলতা বজায় রাখার জন্য সুললিত তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন। তথাপি পুনরুক্তিদোষ, শব্দাড়ম্বর, অলংকার ব্যবহারে কৃত্রিমতা প্রভৃতি ত্রুটি থেকে বিদ্যাসাগরী গদ্য মুক্ত নয়। বিদ্যাসাগরের রচনায় গভীর ভাবস্পন্দনের অভাব আছে। বিদ্যাসাগরী ভাষা অশ্রুবেগে আকুল হয়ে কখনও হোঁচট খায় না, প্রস্তর-মসৃণ রাজপথ দিয়ে সৈনিকশ্রেণীর মতো তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে যায়। মানসিক আবেগস্পন্দিত গদ্যের জন্য আমাদের আরো কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রে এসে এই অভাব দূর হয়। 'কমলাকান্তের দপ্তরের' ভাষা বাংলা গদ্যের সুন্দর নিদর্শন, তা বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ, বেদনায় কোমল, আনন্দে উজ্জ্বল, সমবেদনায় স্নিগ্ধ ; হাসিতে ও কান্নায় সে গদ্যে আলোছায়ার মেশামেশি।

বিদ্যাসাগরের মৌলিক ও অনূদিত গদ্যগ্রন্থের যে তালিকা আমরা পাই, তা এই প্রতিভাশালী ভাষাশিল্পীর পরিচয় বহন করে : বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭),

বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮), জীবনচরিত (১৮৪৯), বোধোদয় (১৮৫১), ঋজুপাঠ (১৮৫১), সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩), শকুন্তলা (১৮৫৪), বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫) কথামালা (১৮৫৬), চরিতাবলী (১৮৫৬), মহাভারত (১৮৬০) সীতার বনবাস (১৮৬০), আখ্যানমঞ্জরী (১৮৬৩), বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (১৮৭১-৭৩), বিদ্যাসাগর-চরিত (১৮৯১), এবং বেনামীতে, অতি অল্প হইল (১৮৭৩), আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩) ব্রজবিলাস (১৮৮৪), বিনয়পত্রিকা (১৮৮৪), রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬)। এ ছাড়া আরও কয়েকটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন ও বারোটি কাব্য সম্পাদনা করেন।

গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছিলেন, তার প্রয়োজনীয় অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি: "বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল কিন্তু তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলা-গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন।... বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন—এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা সকল পরাহত করিয়া নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন —কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্ত্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।...বাঙ্গলা ভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর ভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনীর সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাঙ্গলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটি ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলির নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা-গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য বর্ব্বরতা উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলা-গদ্যের যে

অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃজন ক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।" ('সাধনা' ভাদ্র ১৩০২ সন)।

এখন বিদ্যাসাগরের সাধু ও চলিত গদ্যের নিদর্শন গ্রহণ করা যাক্।

(ক) "উজ্জয়িনী নগরে গন্ধর্ব্বসেন নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি মহিষী। তাঁহাদের গর্ভে রাজার ছয় পুত্র জন্মে। রাজকুমারেরা সকলেই সুপণ্ডিত ও সর্ব্ব বিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন। কালক্রমে নৃপতির লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে সর্বজ্যেষ্ঠ শঙ্কু সিংহাসনে আরোহন করিলেন। তৎকনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বিদ্যানুরাগ, নীতিপরতা ও শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন; তথাপি রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইযা, জ্যেষ্ঠের প্রাণসংহার পূর্বক স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে নিজ বাহুবলে লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ জম্বু দ্বীপেব অধীশ্বর হইয়া আপন মনে অব্দ প্রচলিত করিলেন।" ['বেতালপঞ্চবিংশতি': ১৮৪৭]—এখানে হ্রস্ব বাক্য ও সরল তৎসম শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

(খ) "ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোব অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস! তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রেব মস্তকে পদার্পন করিয়াছিস, ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস, হিতাহিতবোধের গতিবোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে, শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে। ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত, যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও, তোর অনুগত থাকিয়া, কেবল লৌকিক রক্ষাগুণে, সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে, আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও, তোর অনুগত না হইয়া কেবল লৌকিকরক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই, সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন।....হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি পূর্ব্বতন সন্তানগণের আচারগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে; কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন

করিয়া, তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, সর্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কতকালে তোমার দুরবস্থা বিমোচন হইবেক, তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া, ভাবিয়া স্থির করা যায় না। ['বিধবা-বিবাহ'—২য় পুস্তক : ১৮৫৫]—এখানে ভাষার সাবলীল গতি ও বিরামচিহ্নের প্রয়োগ লক্ষণীয়। ধিক্কার প্রকাশে এ ভাষা সফল হয়েছে।

(গ) "কিয়ৎক্ষণ পরে শান্তিজলপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া গোতমী লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং শকুন্তলার শরীরে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, "বাছা! শুনিলাম, আজি তোমার অসুখ হয়েছিল, এখন কেমন আছ, কিছু উপশম হয়েছে?" শকুন্তলা কহিলেন, "হাঁ পিসি। আজি বড় অসুখ হয়েছিল, এখন অনেক ভাল আছি।" তখন গোতমী কমণ্ডলু হইতে শান্তিজল লইয়া শকুন্তলার সর্ব্বশরীরে সেচন করিয়া কহিলেন, "বাছা! সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবিনী হয়ে থাক।" অনন্তর লতামণ্ডপে অনসূয়া অথবা প্রিয়ংবদা কাহাকেও সন্নিহিত না দেখিয়া কহিলেন, "এই অসুখ, তুমি একলা আছ বাছা, কেউ কাছে নাই।" শকুন্তলা কহিলেন, "না পিসি! আমি একলা ছিলাম না, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা বরাবর আমার নিকট ছিল; এইমাত্র মালিনীতে জল আনিতে গেল।" তখন গোতমী কহিলেন, "বাছা! আর রোদ নাই, অপরাহ্ন হয়েছে এস কুটীরে যাই।" শকুন্তলা অগত্যা তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। রাজাও 'আর আমি প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থাকিয়া কি করি,' এই বলিয়া শিবিরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।"

['শকুন্তলা : ১৮৫৪]—এখানে প্রত্যক্ষ উক্তির ব্যবহারে তদ্ভব শব্দ ও ক্রিয়ারূপের প্রয়োগ বিশেষ লক্ষণীয়।

(ঘ) "সীতা অন্যদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, নাথ! দেখুন দেখুন, এদিকে আমাদের দক্ষিণারণ্য প্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এইস্থানে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে, আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধরিয়া, আতপনিবারণ করিয়াছিলেন। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণী-তীরবর্ত্তী তপোবন; গৃহস্থগণ, বাণপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক, সেই সেই তপোবনের তরুতলে

কেমন বিশ্রামসুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবল-বেগে গমন করিতেছে।" [সীতার বনবাস: ১৮৬০]—এই অংশে স্নিগ্ধ গম্ভীরঘোষ তৎসম শব্দাবলীর ধ্বনিরোলে কেবল 'পথের পাঁচালী'র কিশোর অপু মুগ্ধ হয়েছিল তা নয়, বাংলা দেশের সকল ছাত্রই এই ধ্বনিলালিত্য ও শব্দ ঝঙ্কারে মুগ্ধ হয়।

(ঙ) "**ফাজিল চালাকেরা** স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মত বিজ্ঞ বোদ্ধা যোদ্ধা ভূমণ্ডলে আর নাই। তাঁহারা যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত করেন, অন্যে যাহা বলুক তাঁহাদের মতে তাহা অভ্রান্ত ও অকাট্য। শুনিতে পাই, আমার এই ক্ষুদ্র মহাকাব্যখানি অনেকের **পছন্দসই** জিনিস হইয়াছে। সেই সঙ্গে ইহাও শুনিতে পাই, **ফাজিল চালাকেরা** রটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা বিদ্যাসাগর লিখিত। যাঁহারা সেরূপ বলেন, তাহারা যে নিরবিচ্ছিন্ন **আনাড়ি** তাহা এক কথায় সাব্যস্ত করিয়া দিতেছি।

এক গণ্ডা মাস অতীত হইল, বিদ্যাসাগর **বাবুজী**, অতি **বিদকুটে**, পেটের পীড়ায় **বেয়াড়া** জড়ীভূত হইয়া পড়িয়া **লেজ নাড়িতেছেন**, উঠিয়া পথ্য করিবার **তাকত** নাই। এ অবস্থায় তিনি এই **মজাদার** মহাকাব্য লিখিয়াছেন, একথা যিনি রটাইবেন, অথবা এ কথায় যিনি বিশ্বাস করিবেন, তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির **দৌড় কত** তাহা সকলে স্ব স্ব প্রতিভাবলে অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন।" ['কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' প্রণীত ব্রজবিলাস: ১৮৮৪]—এই অংশের স্টাইল নিঃসন্দেহে চলতি ভাষার স্টাইল। তদ্ভব, দেশী, বিদেশী শব্দ প্রয়োগে অকুণ্ঠ উৎসাহ বড় টাইপের শব্দগুলিতে লক্ষণীয়। বিদ্রূপে এই অংশটি ঝল্‌মল্ করছে। যে বিদ্যাসাগর সাধু গদ্যের স্রষ্টা, তিনিই যে এই তরল চল্‌তি ঢঙের লেখক, তা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। এই চল্‌তি ঢঙের গদ্য বিদ্যা-সাগরের সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয়স্থল।

অক্ষয়কুমার দত্ত

গদ্যের মূল উৎস যুক্তিনিষ্ঠ ও আবেগমুক্ত সত্যদিদৃক্ষা। এই মনোভাবের সুপ্রসারে গদ্যেরও সুপ্রসার ও চর্চা হয়। উনিশ শতকের বাংলা গদ্যে এই মনোভাবটি প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আবেগমুক্ত সত্যদিদৃক্ষা শেষ পর্যন্ত আবেগপ্রধান কল্পনার কাছে পরাজিত হল, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের গদ্য।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গদ্যের প্রথম সার্থক শিল্পী, একথা অনস্বীকার্য। সাহিত্য-গুণোপেত ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ গদ্যের স্রষ্টা হিসেবে বিদ্যাসাগরের আসন অবিচল থাকবে। বাংলা গদ্যের উন্নতি সাধনে বিদ্যাসাগরের প্রধান সহায়ক ছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্ত। বস্তুত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৪) তিনের সম্মিলিত সাহিত্যসাধনার ফল মাত্র।

সহজ সাবলীল গদ্যরচনায় বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু যুক্তিপন্থী গদ্যে অক্ষয়কুমারের অধিকার, অবশ্যমান্য। রামমোহন রায় ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যে তর্কের ভাষা, যুক্তির ভাষার চর্চা সুরু করেন, তা অক্ষয়কুমারের হাতে পরিণতি লাভ করেছিল। যুক্তিপ্রধান ভাববাহী টেঁকসই চিন্তাসমৃদ্ধ গদ্যের চর্চা দুরূহ দর্শন ও বিজ্ঞান-আলোচনায় অত্যাবশ্যক, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। অক্ষয়কুমার (১৮২০-১৮৮৬) এই দিকেই ঝোঁক দিয়েছিলেন। অক্ষয়কুমারের গদ্য কাব্য-গুণসমৃদ্ধ ভাববাহী গদ্য নয়, তা প্রস্তরকঠিন যুক্তিপন্থী টেঁকসই গদ্য; বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ বিষয়ক বিতর্কে এই যুক্তিপন্থী গদ্যের কিছু চর্চা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মূল রচনা অলংকারসমৃদ্ধ ভাববাহী গদ্যে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্যও ভাববাহী গদ্য। তাই এই ত্রয়ীর মধ্যে অক্ষয়কুমারই যুক্তিবাহী গদ্যের প্রধান লেখক। পরে এই ধারার সযত্ন চর্চা করেন বঙ্কিমচন্দ্র (বিবিধ প্রবন্ধে), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

অক্ষয়কুমারের সাহিত্যসাধনার কয়েকটি ঘটনা আমাদের জানা প্রয়োজন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা করার সময়ে তিনি ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার

উপর দুটি বই লেখেন। এই 'ভূগোল' (১৮৪১) ও 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬) তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় অক্ষয়কুমার 'বিদ্যাদর্শন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম সংখ্যায় অক্ষয়কুমার লেখেন :

"সম্প্রতি এই পত্রের বিশেষ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিবার জন্য সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নদেশে প্রকাশ করিতেছি। এতৎ পত্রে এমত সকল বিষয়ের আলোচনা হইবেক, যদ্দ্বারা বঙ্গভাষায় লিপি বিদ্যায় বর্তমান রীতি উত্তম হইয়া সহজে ভাব প্রকাশের উপায় হইতে পারে। যত্নপূর্ব্বক নীতি ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবেক এবং দেশীয় কুরীতির প্রতি বহুবিধ যুক্তি ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা হইবেক।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'স্বরচিত জীবন-চরিতে' অক্ষয়কুমার প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল প্রভেদ। ফলতঃ আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম।" [দ্রঃ—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা,' প্রথম খণ্ড।]

অক্ষয়কুমারের মনের গতি কোনদিকে, তা এই দুটি বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। সাহিত্যিক কল্পনাশক্তি তাঁর ছিল না, কিন্তু অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা থাকায় সংগৃহীত জ্ঞান তাঁর কাছে দুর্বহ হয়ে ওঠে নি, প্রাঞ্জল সাবলীল গদ্যে তা প্রকাশ লাভ করেছে।

অক্ষয়কুমারের প্রধান বইগুলি হচ্ছে : 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (দুই ভাগ ১৮৫১ ও ১৮৫৩), 'চারুপাঠ' (তিন ভাগ ১৮৫৩, '৫৪, '৫৯) 'ধর্ম্মনীতি' (১৮৫৬) ও ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (দুইভাগ, ১৮৭০ ও ১৮৮৩)। এ ছাড়া কয়েকটি পুস্তিকা তিনি লেখেন।

দুরূহ দর্শন ও বিজ্ঞান-চিন্তাকে সরল প্রাঞ্জল গদ্যে প্রকাশ করার অসাধারণ নৈপুণ্য অক্ষয়কুমারের ছিল। তিনি যুক্তিবাহী গদ্যের যে রীতি প্রতিষ্ঠা করেন, তাই পরবর্তীকালে দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস-সম্পর্কিত বাংলা প্রবন্ধে অনুসৃত হয়। অক্ষয়কুমারের গদ্যরীতিতে সমাসবাহুল্য ও গুরুভার বিশেষণ একেবারেই নেই; গদ্যের গতি সাবলীল, পূর্ব্বের আড়ষ্টতা এখানে অনুপস্থিত। রামমোহন ও কৃষ্ণমোহনের যুক্তিপন্থী গদ্যে অনায়াসগতি ছিল না, তা এসেছে অক্ষয়কুমারের গদ্যে। এই গদ্যে মাধুর্য ও সাহিত্যরস বিশেষ নেই, তৎসমশব্দবহুল সাবলীল গদ্যরীতির প্রাঞ্জলতা আছে।

এবার অক্ষয়কুমারের গদ্যের কিছু উদাহরণ দিই।

'হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা' (১৮৪৫) থেকে: "সপ্তাহ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পরে সূর্য্য প্রকাশ হইলে চিত্ত কি প্রকার প্রফুল্ল হয়! গ্রীষ্মেতে গাত্র দাহ হইয়া পরে মন্দ মন্দ শীতল বায়ুর হিল্লোলে শরীর স্নিগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে অন্তঃকরণে কি প্রকার সন্তোষের উদয় হয়! সেইরূপ হিন্দুদিগের মলিন চরিত্রকে ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট দেখিয়া চিত্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছে। আমরা কতকাল আক্ষেপ করিতেছি, যে স্বদেশের মঙ্গল চেষ্টা করা যে মনুষ্যের প্রধান ধর্ম তাহা ভারতবর্ষস্থ লোকদিগের চিত্ত হইতে লুপ্ত হইয়াছে—অনুৎসাহ, অল্প প্রতিভা, দ্বেষ, কলহ, বিচ্ছেদ আমারদিগের মহাশত্রু হইয়াছে। আমরা কতকাল আক্ষেপ করিতেছি, যে আমারদিগের জ্ঞানের প্রতি সমাদর নাই, সত্যের প্রতি প্রীতি নাই, কোন কর্ম্মের উদ্যম নাই, এবং যতক্ষণ কোন বিপদ মস্তকোপরি পতিত না হয় ততক্ষণ তাহার প্রতি দিক্‌পাতও হয় না।"

'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১৮৫১) থেকে:

"বিশ্বনিয়ন্তার নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে, পরম সুখোদ্দেশ্য উদ্বাহ-ক্রিয়াও অশেষ যাতনার মূল হইয়াছে; পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব, অসম-বুদ্ধি ও বিপরীত মতাবলম্বী স্ত্রীপুরুষের পাণিগ্রহণ হইলে, উভয়কেই যাবজ্জীবন বিষম যন্ত্রণা ভোগ মানসিক ভাব ও বুদ্ধি চালনা বিষয়ে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকাতে, কত কত দম্পতি মহা অসুখে কাল যাপন করিয়া থাকেন। উভয়ের মানসিক বৈলক্ষণ্যই

অনৈক্য ঘটার একমাত্র কারণ। যদিও প্রথম উদ্যমে তাঁহাদেব প্রণয় সঞ্চাব হইলেও হইতে পাবে, কিন্তু তাহা অধিককাল স্থায়ী হয না। পবম সুন্দরী ভার্য্যার কুসুম সদৃশ মনোহর লাবণ্যও অবিলম্বে অতি মলিন বোধ হয়, এবং পূর্ব্বে যে অপ্রণয়-রূপ অগ্নি-ব ণা মোহরূপ নিবিড় আববণে আচ্ছন্ন ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকে।"

বহু বৈজ্ঞানিক ইংরেজী শব্দের বাংলা পবিভাষা লেখক তৈরি কবেছিলেন, তা এই গ্রন্থের শেষে দেওযা আছে।

'ধর্মনীতি' (১৮৫৬) থেকে :

পবমেশ্বর মনুষ্যকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত করিযাছেন, তন্মধ্যে ধর্ম্ম সর্বাপেক্ষা প্রধান। তিনি ভূমণ্ডলস্থ সমুদয় প্রাণীকেই ইন্দ্রিয-সুখ-সম্ভোগে সমর্থ করিয়াছেন, তাহাব মধ্যে মনুষ্যকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভে অধিকাবী কবিযা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবিযাছেন। এই দুই বিষযেব ক্ষমতা থাকাতে, মনুষ্য-নামেব এত গৌবব হইযাছে, এবং এই দুই বিযযে কৃতকার্য্য হইলেই মনুষ্যের যথার্থ মহত্ত্ব উৎপন্ন হয়, সুখ যে এমন অনির্ব্বচনীয পবম প্রার্থনীয পদার্থ, ধর্ম্মস্বরূপ রত্নজ্যোতি তদপেক্ষাও শতগুণে উৎকৃষ্ট।"

'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬) থেকে :

"চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বাবা যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ কবা যায, সে সমুদয়ই জড় পদার্থ।

জড় পদার্থ দুই প্রকার, সজীব ও নির্জীব। যাহার জীবন আছে, অর্থাৎ যথাক্রমে জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস ও মৃত্যু হয় তাহাকে সজীব কহে, যেমন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি। আর যাহাব জীবন নাই, সুতরাং যথাক্রমে জন্ম, বৃদ্ধি হ্রাসাদি হয় না, তাহাকে নির্জীব বলা যায, যেমন প্রস্তর, মৃত্তিকা, লৌহ ইত্যাদি।

যে বিদ্যা শিক্ষা কবিলে নির্জীব জড় পদার্থের গুণ ও গতির বিষয় জ্ঞাত হওযা যায়, তাহার নাম পদার্থ-বিদ্যা।"

'চারুপাঠ' তৃতীয় ভাগ (১৮৫৯) থেকে ঃ

স্বপ্নদর্শন—কীর্ত্তিবিষয়ক

"আহা কি দেখিলাম ! এমন অদ্ভুত স্বপ্ন কখনও দেখি নাই। এমত কলরব পরিপূর্ণ লোকাকীর্ণ স্থানও কোথাও দৃষ্টি করি নাই। এই অসীম ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে, এক পরম শোভাকর অপূর্ব্ব পর্ব্বত দর্শন করিলাম। সে পর্ব্বত এত উচ্চ যে, তাহার শিখর নভোমণ্ডলস্থ মেঘসমুদয় ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তাহার পার্শ্বদেশ অত্যন্ত বন্ধুর ও দুরারোহ ; মনুষ্য ব্যতিরেকে আর কোন জন্তুর তথায় আরোহণ করিবার সামর্থ্য নাই। আমি অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কখনও অনিমেষ ঊর্দ্ধ নয়নে পর্ব্বতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম, কখনও বা লোকসমারোহ এবং তাহাদের বিবিধ-বিষয়ক যত্ন, চেষ্টা, ঔৎসুক্যাদি নিরীক্ষণ ও পর্য্যালোচন করতঃ ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছিলাম।"

এই উদ্ধৃতিগুলি যুক্তিপন্থী গদ্যের পরিচায়ক। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে শিবনাথ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু, জগদানন্দ রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যুক্তিপন্থী গদ্যকারবৃন্দ অক্ষয়কুমার-প্রবর্তিত পথেই দুরূহ দর্শন ও বিজ্ঞান-চিন্তাকে সরল প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

এখানেই গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমারের সার্থকতা।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গত শতকের প্রথমার্ধে সাময়িক পত্রিকার আসরে বাংলা গদ্যের বহুল চর্চা হয়। বস্তুত এখানেই সাহিত্যিক গদ্যের সৃষ্টি হয়। এই পর্বের প্রধান মাসিক পত্রিকা হচ্ছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ভাদ্র প্রথম প্রকাশিত)। এই পত্রিকা গত শতকের প্রথমার্ধের তিন প্রধান গদ্যশিল্পীর মিলিত সাধনার ফল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই তিনের সাধনায় বাংলা সাধু গদ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে "গ্রন্থ কমিটি" ছিল, তার প্রধান সদস্য এই তিনজন। দেবেন্দ্রনাথ এই কমিটির অধ্যক্ষ, অক্ষয়কুমার সম্পাদক এবং ঈশ্বরচন্দ্র প্রধান সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু এই কমিটির সদস্য ছিলেন।

অক্ষয়কুমার মূলত যুক্তিপন্থী গদ্যের চর্চা করতেন, আর ঈশ্বরচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ ভাববাহী গদ্যের চর্চা করতেন। এইভাবে এই তিন গদ্যকার সাধু গদ্যের কাঠামোটি তৈরি করেছিলেন। ত্রয়ীর প্রধান ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলা গদ্যের অনতিলক্ষ্য ছন্দপ্রবাহ তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন এবং সাহিত্যিক সুষমা সৃষ্টি করেন। তাঁর পথেই বাকি দুজন এগিয়েছিলেন। কালবিচারেও ঈশ্বরচন্দ্র অগ্রবর্তী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম গ্রন্থ "বেতালপঞ্চবিংশতি" প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে; অক্ষয়কুমার দত্তের প্রথম বড় বই "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" প্রকাশিত হয় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে; আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম গ্রন্থ "ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ" প্রকাশিত হয় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর "আত্মজীবনী" রচিত ও প্রকাশিত হওয়ার আগে বঙ্কিমের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছিল।

বস্তুত, বিদ্যাসাগরের সাধু গদ্যের কাঠামোর উপরই দেবেন্দ্রনাথ সরল সুললিত ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ বাংলা গদ্য গড়ে তোলেন। রাজনারায়ণ বসু যথার্থই বলেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন আপনার প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতি গ্রন্থ দ্বারা বঙ্গভাষার বর্তমান উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন, দেবেন্দ্রবাবুও সেই

এক সময়েই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ ও সংশোধন দ্বারা সেই উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন।" ("বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা", পৃ ৬৫)।

অক্ষয়কুমারেরর গদ্য "কেজো" গদ্য—তা প্র্যাকটিক্যাল; দুরূহ বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্বকে সহজভাবে প্রকাশ কর্‌তেই তাঁর দক্ষতা। আর বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।" "শকুন্তলা" (১৮৫৪) ও "সীতার বনবাস" (১৮৬১) গ্রন্থদ্বয়ে বিদ্যাসাগরের রচনারীতির চরম বিকাশ ঘটেছে—স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষ সুললিত গদ্যপ্রবাহে পাঠকচিত্ত অভিষিক্ত হয়।

এই পটভূমিকায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃতিত্ব বিচার্য। তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশনগুলিতে দেবেন্দ্রনাথ যে বক্তৃতাগুলি দেন, তাতেই গদ্যশিল্পী দেবেন্দ্রনাথের প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়। পরে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যরূপে উপাসনা বেদীতে বসে তিনি যে সকল উপদেশ দেন, সে-গুলিতে দেখি তার বলার ঢঙ ও ভাষা ক্রমশ সাবলীল ও সুললিত হয়ে উঠেছে। দেবেন্দ্রনাথের প্রধান গ্রন্থনিচয়ের তালিকা এই: (১) ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ (১৮৫১), (২) আত্মতত্ত্ববিদ্যা (১৮৫২), (৩) ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস (১৮৬০), (৪) দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্য সংগ্রহার্থে বক্তৃতা (১৮৬৯), (৫) কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা (১৮৬২), (৬) ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান (১৮৬১ ও ১৮৬৬), (৭) জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি (১৮৯৩), (৮) আত্মজীবনী (১৮৯৮)।

অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর থেকে দেবেন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে গদ্যশিল্পী দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় নিহিত আছে। কি ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, কি আপন জীবনকথাবিবৃতি, কি ব্রাহ্মসমাজের কর্তব্যনির্ধারণ—সর্বত্রই দেবেন্দ্রনাথের রচনায় তাঁর ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট। এখানেই তিনি অপর দুজন থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। তাঁর সমসাময়িক আর কোনও গদ্যলেখকের রচনায়

সমস্ত মানুষটার ছাপ এত প্রবল ও প্রকটরূপে প্রকাশ পায়নি। স্টাইলের দ্বারাই লেখককে চিনি, প্রাগ্-বঙ্কিম গদ্যসাহিত্যে এই মন্তব্য দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কেই করা চলে।

লেখকের ব্যক্তিপুরুষের সহজ নিরাভরণ অনাড়ম্বর প্রকাশ, দেবেন্দ্র-রচনাবলীতে অনায়াসলক্ষ্য। "মহর্ষি" উপাধি এই সহজ প্রকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি, বিত্তশালী প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র—এই পরিচয়ও লেখক ও পাঠকের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়নি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মালিকের কর্তৃত্ব-গৌরব প্রবল হয়ে ওঠেনি, তাই দেবেন্দ্রনাথের স্টাইল তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশমাত্র। এখানেই তাঁর রচনারীতির স্বাতন্ত্র্য। এইজন্যই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্যরূপে উপাসনাবেদী থেকে প্রদত্ত ভাষণও সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছে, শাস্ত্রব্যাখ্যান শাস্ত্র কচকচি না হয়ে হৃদয়ানুভূতির প্রকাশবাহন হয়েছে, "আত্মজীবনী" একান্ত কাছের মানুষের আন্তর-পরিচয় রূপে প্রকাশিত হয়েছে। ধ্যাননিমগ্ন মহর্ষি ও হাস্যোজ্জ্বল পরিহাসরসিক জীবন্ত মানুষ—এ দুয়ের মধ্যে কোথাও ছেদ নেই, ব্যবধান নেই, কৃত্রিম আড়াল নেই। "আত্মজীবনী" রচয়িতা পাঠকের উপদেষ্টা নয়, বন্ধু হয়ে উঠেছেন। আর এই সহজ-সরল ব্যক্তিত্বের নিরাভরণ প্রকাশ যে রচনারীতি তা স্বভাবতই সাবলীল, লিবিকধর্মী, বেগবতী। দেবেন্দ্রনাথের বর্ণনাভঙ্গি প্রত্যক্ষ, খুঁটিনাটিতে পূর্ণ, বৈচিত্র্যে তা মনোরম, হাস্যে পরিহাস্যে তা কোমল ও স্নিগ্ধ। "আত্মজীবনী"র ষড়বিংশ, দ্বাত্রিংশ ও পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদের সুন্দর ভ্রমণ-বর্ণনা এই মতের পোষকতা করবে।

এইবার দেবেন্দ্রনাথের রচনা থেকে কিছু কিছু নিদর্শন তুলে দিচ্ছি। এর থেকেই দেবেন্দ্র-রচনারীতির উপরোক্ত গুণাবলীর সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে। "ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান" থেকে ঃ

"ভূলোকে দ্যুলোকে, আকাশে অন্তরীক্ষে, উষাকালে, সন্ধ্যাকালে, শ্রদ্ধাবান একনিষ্ঠ ধীরেরা সেই স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন। উষার উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য উদিত হইয়া যখন অচেতন প্রাণিগণকে সচেতন করে; রূপহীন বস্তুসকলকে রূপবান করে; তখন সেই জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যের মধ্যে সেই প্রকাশবান্ বরণীয় পুরুষকে তাঁহারা দেখিতে

পান। উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরাকাশে তাঁহার আলোক প্রকাশ পায়। যিনি সূর্য্যের অন্তরাত্মা আমাদের অন্তরাত্মা, সকল ভূতের অন্তরাত্মা, তিমিরযুক্ত জগতের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ হয়। তরুণ সূর্য্যকিরণে সেই জ্যোতির জ্যোতি দেখিতে পাই। উষার সৌন্দর্য্যে সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হন। আমাদের নিমীলিত নয়ন মুক্ত হইবামাত্র তাঁহার চক্ষু আমাদের উপরে স্থাপিত দেখি। তাঁহার মহিমা সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। আমরা যদি তাঁহার জন্য ব্যাকুল হই; যদি সরল হৃদয়ে তাঁহাকে প্রার্থনা করি; যদি ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুতেই আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ না হয়; তবে অন্তরে বাহিরে, দূরে নিকটে, সকল স্থানেই তাঁহার প্রকাশ দেখা যায়।……সূর্য্যকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায়। সূর্য্য তাঁহাকে দেখাইয়া দেন! বনের নির্জন বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায়! তাহা হইতে উত্তর পাই। তখন দেখিতে পাই, "স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ।" তিনি অধোতে, তিনি ঊর্ধেতে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। ভূলোক ও দ্যুলোক তাঁহার এই মহিমা; তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন; আমাদের কঠিন হৃদয়ের কপাট বদ্ধ করিয়া রাখি বলিয়া সেই জ্যোতির জ্যোতিকে দেখিতে পাই না। সূর্য্যের অভ্যুদয়ের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব। যেমন উষাতে সেই প্রকার সন্ধ্যাতেও তাঁহার প্রসন্ন মূর্ত্তি প্রকাশিত রহিয়াছে। যখন রজনীর ছায়া বসুধাকে শান্তি ও বিশ্রামে নিমগ্ন করে, যখন চন্দ্রমা অনেক সহস্র রশ্মিতে উথিত হইয়া জ্যোৎস্না-বর্ষণ করে, যখন তারকাগণ এই নিদ্রিত জগতের প্রহরীরূপে বিরাজ করিতে থাকে, তখন তাহার মধ্যে কাহার প্রকাশ দেখা যায়? 'যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠন চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্র-তারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়তি।' যিনি চন্দ্রতারকে থাকিয়া—চন্দ্রতারকের অন্তরে থাকিয়া চন্দ্রতারককে নিয়মে রাখিতেছেন চন্দ্রতারক যাঁহাকে জানে না, চন্দ্রতারক যাঁহার শরীর; তাঁহারই প্রকাশ দেখা যায়।"

[প্রথম প্রকরণ, দ্বিতীয় ব্যাখ্যান]

পুনশ্চ,

"এক সময় যখন সকলি অসৎ ছিল, একমাত্র অনাদ্যন্ত নিবিড় অন্ধকার ছিল; তখন সেই সনাতন পুরাণই স্বীয় জ্ঞানজ্যোতিতে বিরাজ করিতেছিলেন! সেই সময়কার কি গহন গম্ভীর ভাব! যদি বর্ষা ঋতুর কোন নিশীথ সময়ে কোন উচ্চতর স্থান হইতে চতুর্দিক দর্শন করি—তখন একটি গ্রহ, একটি তারাও আর নয়ন-গোচর হয় না—সমুদয় আকাশ ঘন্ মেঘে আবৃত, সকলি নিস্তব্ধ, কেবলি অন্ধকার—তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে রোমাঞ্চিত শরীরে তটস্থ হইয়া যে স্বয়ম্ভূ সনাতন পুরুষের সাক্ষাৎ অনুভব করি; কেবল একমাত্র তিনিই এই জগৎ-উৎপত্তির পূর্ব্বে আদিম অন্ধকারের মধ্যে স্বীয় সত্যজ্ঞান-জ্যোতিতে প্রকাশমান ছিলেন। সতপোঽতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তিনি ইচ্ছা করিলেন—কিছু ছিল না, আর সকলি হইল। তিনি জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যকে সৃজন করিলেন, আর অন্ধকার দূর হইল। সেই চির রজনীর পর প্রথম প্রাতঃকালের কি আশ্চর্য্য শোভা দীপ্তি পাইয়াছিল। সেই নিস্তব্ধ চির-রজনী ভেদ করিয়া নবপ্রসূত তেজঃপুঞ্জ সূর্য্য কোথা হইতে আইল। কোথা হইতে ইহা সহস্র রশ্মি ধারণ করিয়া দিগ্বিদিক উজ্জ্বল করিল?"

[প্রথম প্রকরণ, ত্রয়োদশ ব্যাখ্যান]

এইবার "আত্মজীবনী" থেকে খানিকটা উধৃতি দিচ্ছি। সজীব বর্ণনায় ও আন্তরিকতায় এই অংশটি ভাস্বর হয়ে উঠেছে! অমৃতসরের বর্ণনা:

"আমি অমৃতসরে রামবাগানের নিকটে যে বাসা পাইয়াছিলাম, তাহা ভাঙ্গা বাড়ী, ভাঙ্গা বাগান, এলোমেলো গাছ—জঙ্গলা রকম। কিন্তু আমার নবীন উৎসাহ তাজা চক্ষু সকলি তাজা, সকলি নূতন, সকলি সুন্দর করিয়া দেখিত। অরুণোদয়ে প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেত পীত লোহিত ফুল সকল শিশির-জলের অশ্রুপাত করিত, যখন ঘাসের রজত-কাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যান-ভূমিতে জরির মছনদ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া বাগানে মধু বহন করিত, যখন দূর হইতে পাঞ্জাবীদের সুমধুর সঙ্গীতস্বর উদ্যানে সঞ্চরণ করিত, তখন তাহাকে আমার এক গন্ধর্ব্বপুরী বোধ

হইত। কোন কোন দিন ময়ূর-ময়ূরীর বন হইতে আসিয়া আমার ঘরে ছাদের একতলায় বসিত এবং তাহাদের চিত্র বিচিত্র দীর্ঘ পুচ্ছ সূর্যকিরণে রঞ্জিত হইয়া মৃত্তিকাতে লুটাইতে থাকিত, কখনো কখনো তাহারা ছাদ হইতে নামিয়া বাগানে চরিত। আমি তাহাদের ভালবাসিয়া কিছু চাউল হাতে করিয়া লইয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতে যাইতাম তাহারা ভয় পাইয়া কেকা শব্দ করিয়া কোথায় উড়িয়া যাইত। একজন একদিন আমাকে বারণ করিল,—'অমন করিবেন না, উহাঁরা বড় দুষ্ট। যদি ঠোকর মারে তো একেবারে চোখে ঠোকর মারিবে।' একদিন মেঘ উঠিল, আর দেখি যে ময়ূরেরা মাথার উপরে পাখা উঠাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এ কি আশ্চর্য দৃশ্য! আমি যদি বীণা বাজাইতে জানিতাম তবে তাহাদের নৃত্যের তালে তালে তাহা বাজাইতাম। দেখিলাম যে কবিরা ঠিক বলিয়া গিয়াছেন, মেঘ উঠিলেই ময়ূরেরা আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।' 'নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা'! এ তাঁহাদের কেবল মনের কল্পনা মাত্র নহে।

"ফাল্গুন মাস চলিয়া গেল, চৈত্র মাস মধু মাসের সমাগমে বসন্তের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং অবসর পাইয়া দক্ষিণবায়ু আম্র-মুকুলের গন্ধে সদ্য-প্রস্ফুটিত নেবুফুলের গন্ধ মিশ্রিত করিয়া কোমল সুগন্ধের হিল্লোলে দিগ্বিদিক আমোদিত করিয়া তুলিল। ইহা সেই করুণাময়েরই নিশ্বাস। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে দেখি যে, আমার বাসার সংলগ্ন জলাশয়ে কোথা হইতে অপ্সরারা রাজহংসীর ন্যায় উল্লাসের কোলাহলে জলক্রীড়া করিতেছে। এমনি করিয়া চকিতের মধ্যে সুখে কালস্রোত চলিয়া গেল।" (দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ)

এখানে দেবেন্দ্রনাথের গদ্য গীতি-কাব্যের চূড়াকে স্পর্শ করেছে—বনভূমির বসন্ত-আমন্ত্রণ যে লেখকের অন্তরোত্থিত এ-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। গদ্যে সৌন্দর্যসৃষ্টির বিরল দক্ষতা দেবেন্দ্রনাথের ছিল।

তাই গদ্যশিল্পীরূপে দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা অবিচল।

প্যারীচাঁদ মিত্র

উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর যে বাংলা গদ্যের চর্চা হয়, তার পরিচয় এক কথায় এই—তা গদ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ। প্রথমার্ধের শেষে বিদ্যাসাগরের রচনায় এই পরীক্ষার যুগ উত্তীর্ণ হয়ে সাহিত্যিক গদ্য সৃষ্ট হ'ল। একাজে তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর অক্ষয়কুমার দত্ত। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, উইলিয়ম কেরী, রামরাম বসু, চণ্ডীচরণ মুন্সী, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ রায়, গোলোকনাথ শর্মা, রামজয় তর্কালঙ্কার, কালীকৃষ্ণ দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ এঁরা সবাই বাংলা গদ্যের ভারবহন ক্ষমতা ও স্বাবলম্বিতা পরীক্ষা করে দেখছিলেন।

এই পরীক্ষায় দুটি ঝোঁক রয়েছে। একটি কথ্য ভাষার ঝোঁক, অপরটি লেখ্যভাষার ঝোঁক। কথ্যভাষার শিল্পী ছিলেন কেরী, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। বাকি গদ্যলেখকরা লেখ্য ভাষা সৃষ্টি করেন, তাঁদের আদর্শ ছিল ইংরেজী গদ্য। আবার কথ্যভাষার শিল্পীদের মনে ছিল দ্বিধা, তাই তাঁরা লেখার বাহন যে মুখ্যত কথ্যভাষা—প্রতিদিনের ব্যবহৃত গদ্য—তা জোর করে বলতে পারেননি।

এই জোর করে বলবার দিন এলো উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং প্রথম সে কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-৮৩)। প্যারীচাঁদ রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪) নামে বারো পৃষ্ঠার এক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার গদ্য 'সবুজপত্রে'র গদ্যের অগ্রগামী। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যার গোড়ায় এই সম্পাদকীয় মন্তব্য ছাপা হতো—"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।"

গদ্যরচনার এই অভিনবত্ব, তাঁর সম্পর্কে প্রথম কথা। 'ইডিয়ম্যাটিক বাংলা' বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই অবিকৃতভাবে প্যারীচাঁদ 'মাসিক পত্রিকা'য় দিতে চেয়েছিলেন। এতেই 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রতি মাসে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থের প্রকাশকে বাংলা সাহিত্যে যুগান্তকারী ঘটনা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: "প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক।. ...যে ভাষা সকল বাঙালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন।......আমি এমন বলিতেছি না যে, 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষা আদর্শ ভাষা, উহাতে গাম্ভীর্য্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাবসকল সকল সময়ে পরিস্ফুট করা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু উহাতে প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজন মধ্যে কথিত ও প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয় এবং যে সর্ব্বজনহৃদয়গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্পলাভ নহে, এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতি দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরী অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালের' পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় উপযুক্ত ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।" ('আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থের ভূমিকা)।

বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদের গদ্যকে আদর্শ গদ্য বলেন নি, এক চরম সীমার গদ্য বলেছেন। তারাশঙ্কর তর্করত্নের কাদম্বরী অনুবাদ-গ্রন্থের (১৮৫৪) গদ্যকে অপর এক চরম সীমার গদ্য বলেছেন। 'কাদম্বরী'র গদ্যের নমুনা: "সন্ধ্যা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তাহার শোকে দুঃখিত ও তিমিররূপ মলিন বসনে অবগুণ্ঠিত হইয়া বিভাবরী আগমন করিল। ভাস্করের প্রতাপে গ্রহগণ তস্করের ন্যায় ভয়ে লুকাইয়া ছিল; অন্ধকার পাইয়া অমনি গগনমার্গে বহির্গত হইল। পূর্ব্বদিগ্ভাগে সুধাংশুর অংশু অল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বোধ হইল যেন, প্রিয়সমাগমে আহ্লাদিত হইয়া পূর্ব্বদিক্ দশনবিকাশ পূর্ব্বক মন্দ মন্দ হাসিতেছে। প্রথমে কলামাত্র, ক্রমে অর্দ্ধমাত্র, ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণমণ্ডল শশধর প্রকাশিত হওয়াতে সমুদয় তিমির বিনষ্ট হইয়া গেল। কুমুদিনী বিকশিত হইল। মন্দ মন্দ সন্ধ্যাসমীরণ সুখাসীন আশ্রমবৃক্ষগণকে আহ্লাদিত করিল। জীবলোক আনন্দময়, কুমুদ গন্ধময়, তপোবন জ্যোৎস্নাময় হইল।"

সংস্কৃতানুসারী এই গদ্যরীতি সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ ও গুরুভার যৌগিক শব্দের ভারে মন্থরগতি।

আর প্যারীচাঁদের গদ্যরীতি দ্রুতগতি, হাল্‌কা, সর্ববোধগম্য, স্বচ্ছন্দ। এতে প্রচুর তদ্ভব ও ফারসি শব্দের ব্যবহার আছে। ত্রুটি হল, ক্রিয়াপদে সাধু ও কথ্যভাষার মিশ্রণ। সমাসযুক্ত পদের পরিবর্জন, ভাষালংকারের বিরলতা, তদ্ভব ও বিদেশী শব্দের বাহুল্য, ইডিয়ম্ ও প্রবাদবাক্যের বহুল প্রয়োগ—এই গদ্যরীতিকে কাদম্বরীর গুরুভার ভাষা থেকে অনেক অগ্রসর ভাষারীতি বলা যায়। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের দাবী সম্পূর্ণ মানা যায় না—খাঁটি কথ্যরীতিতে এই গদ্য লিখিতে হয় নি। ক্রিয়াপদে যুগপৎ সাধু ও চলিত রূপের ব্যবহার এই ভাষারীতিকে গুরুচণ্ডালদোষযুক্ত করেছে। একে তাই বলা যায়, 'মিশ্র সাধুভাষা' (দ্রঃ—সুকুমার সেন—'বাংলা সাহিত্যে গদ্য', পৃঃ ৯০)।

'আলালের ঘরের দুলালে'র এই মিশ্র সাধুকথ্য ভাষার দুটি নমুনা দিই।

"বাবুরাম বাবু চৌ গোঁপ্পা—নাকে তিলক—কস্তাপেড়ে ধুতি পরা, ফুল-পুকুরে জুতা পায়—উদরটি গণেশের মত—কোঁচান চাদরখানি কাঁধে—এক-

গাল পান—ইতস্ততঃ বেড়াইয়া চাকরকে বলছেন—"অরে হরে, শীঘ্র বালী যাইতে হইবে, দুই চার পয়সায় একখানা চলতি পান্সী ভাড়া কর তো।" বড় মানুষের খান্সামারা মধ্যে মধ্যে বে-আদব হয়। হরি বলিল, "মহাশয়ের যেমন কাণ্ড! ভাত খেতে বস্তেছিনু—ডাকাডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এস্তেচি—ভেটেল পান্সি হইলে অল্প ভাড়ায় হইত—এখন জোয়ার—দাঁড় টানিতে ও ঝিঁকে মার্তে মাঝিদের কালঘাম ছুটবে—গহনার নৌকায় গেলে দুইচার পয়সায় হতে পারে—চলতি পান্সী চার পয়সায় ভাড়া করা আমার কর্ম্ম নয়—একি থুতকুড়ি দিয়ে ছাতু গোলা?"

"অতএব ঠকচাচা ভারি ব্যাঘাত উপস্থিত দেখিল এবং ভাবিল, আশার চাদ বুঝি নৈরাশ্যের মেঘে ডুবে গেল, আর প্রকাশ বা না পায়! তিনি মনোমধ্যে অনেক বিবেচনা করিয়া একদিন বাবুরাম বাবুকে বলিলেন—"বাবু সাহেব! তোমার ছোট লেড়কার ডৌল নেগা করে মোর বড় গমি হচ্ছে। মোর মালুম হয়, ও না দেওয়ানা হয়েছে—তেনা মোর উপর বড় খাপ্পা, দশ আদমির নজদিকে বলে, মুই তোমাকে খারাপ কর্লাম—এ বাত শুনে মোর দেলে বড় চোট লেগেছে, বাবুসাহেব! এ বহুত বুরা বাত—এজ এসমাফিক মারে বল্লে—কেল তোমাকেও শক্ত শক্ত বল্তে পারে। লেড়কা ভাল হবে—নরম হবে—বেতামিজ ও বজ্জাত হলো, এলাজ দেওয়া মোসাহেব। আর যে ববক সবক পড়ে, তাতে যে জমিদারি থাকে, এতনা মোর একেলে মালুম হয় না।"

এই ভাষাকে মিশ্র সাধুভাষাও বলা যায়, আবার সঙ্কর কথ্য ভাষাও বলতে পারি। মোট কথা, কথ্যরীতিকে সাহিত্যের আম্‌দরবারে চলাবার চেষ্টা প্যারীচাঁদই প্রথম করেন।

'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) ও 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯) কথ্যভাষায় লেখা। আবার 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫) ও 'অভেদী' (১৮৭১) বিদ্যাসাগরী ভাষায় লেখা। প্যারীচাঁদ বাংলা কথ্যভাষা নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। সংস্কারমুক্তি গদ্যশিল্পী প্যারীচাঁদের প্রধান গুণ।

পুনর্বার বলি, আলালী ভাষা আদর্শ ভাষা নয়। সাহিত্যে যে শিষ্ট কথ্যভাষা ব্যবহার হয়, তা প্যারীচাঁদ সৃষ্টি করেননি। ষাট বছর পরে 'সবুজপত্রে' প্রথম চৌধুরী আদর্শ কথ্যভাষা ব্যবহার করেন। তবে প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের গৌরব কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫ সাল)। প্রাসঙ্গিক অংশটি তুলে দিয়ে এ আলোচনা শেষ করছি :

"সংস্কৃতপ্রিয় এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্ব্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত, ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গলার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ বিরূত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ণ করিলেন। সেইদিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেইদিন হইতে শুষ্কতরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।"

কালীপ্রসন্ন সিংহ

মাত্র তিরিশ বছর যাঁর জীবনকাল, তিনিই গত শতকের মধ্যবিন্দুতে কল্লোলিত কলকাতার নব-সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান পুরুষ। নাটক ও গদ্যরচনায়, বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও পত্রিকা স্থাপনে, মাইকেল-অভিনন্দনে যিনি নোতুন যুগের বাণীকে প্রচার করেছিলেন, তিনিই সমগ্র সংস্কৃত মহাভারতের গদ্যানুবাদে ও সমাজ-সংস্কারে হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি আপন নিঃসংশয় শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন। ইংরেজি ও সংস্কৃত: এই দুই বিপরীত ধারার আঘাতে তিনি বিপর্যস্ত হন নি, পরন্তু নোতুন যুগের সংস্কৃতিবান বাঙালী রূপে দেখা দিয়েছিলেন। তিনিই প্রখ্যাতিকীর্তি কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০—৭০)।

কালীপ্রসন্নের বিচিত্র কর্মাবলী আলোচনার স্থান এখানে নেই। তাঁর মন যে কত সজাগ ও উদার, প্রগতিশীল ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল, তা দেখানোর জন্য উপরোক্ত প্রসঙ্গের অবতারণা। এই সজাগ সদা-কুতূহলী শিক্ষিত মন বাংলা গদ্যের সংস্কারেও এগিয়ে ছিল বলেই আমরা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২) পেয়েছি, আবার মহাভারতের গদ্যানুবাদ (১৮৫৯ ও ১৮৬৬) পেয়েছি। একই সময়ে দুই বিপরীত বিষয়বস্তু ও গদ্যরীতির চর্চা তিনি করেছিলেন। উনিশ শতকী কলকাতার 'বাবু' কালচারের উপর সামাজিক 'স্যাটায়ার' যখন রচনা করছেন, তখনই তিনি পণ্ডিতদের নিয়ে বিপুল মহাভারত অনুবাদ করতে বসেছেন। বস্তুত, বিষয়ানুযায়ী গদ্যরীতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ ব্যবহারের যে নীতি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ব্যাখ্যা করেছিলেন, তারই সমর্থন এখানে পাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা ও সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।...যদি... সে পক্ষে টেকচাঁদী বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি না হয়, আরও উপরে উঠিবে।" (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫ সাল)।

গদ্যশিল্পী কালীপ্রসন্নের দুটি রূপ—একটি হুতোম প্যাঁচা, অপরটি মহাভারত-অনুবাদক। সমগ্র সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ-কর্ম তাঁরই নির্দেশে পরিচালিত হয়েছিল, পণ্ডিতেরা তাঁর আদেশানুযায়ী বাংলা গদ্যের ব্যবহার করেছিলেন। সুতরাং এই বিপুল অনুবাদ-কর্মের গৌরব কালীপ্রসন্নেরই প্রাপ্য। এই গদ্যরীতি মূলত বিদ্যাসাগরী রীতি, কিন্তু তা পূর্বাপেক্ষা সরল ও সাবলীল হয়েছে। সংস্কৃত যৌগিক শব্দ ও সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার এই অনুবাদে কমে এসেছে, আর ক্রিয়াপদও লঘুতর হয়েছে। খানিকটে উদাহরণ নিলেই এই গদ্যরীতির সাবলীলতা ও অনায়াসগতি প্রমাণিত হবে :

"মূষিক আমিষভক্ষণে নিতান্ত ব্যগ্র ছিল, অকস্মাৎ সেই শত্রুদ্বয়কে অবলোকনপূর্বক নিতান্ত ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে,—এইরূপ চতুর্দ্দিকে প্রাণসঙ্কট বিষম আপদ উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণ করিয়া প্রাণ-রক্ষা করাই বুদ্ধিমানদিগের উচিত। অতএব যাঁহারা চতুর্দ্দিক হইতে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহাদিগের জীবন ধন্য।"

কিন্তু কালীপ্রসন্নের গৌরব এখানে নয়। তাঁর খ্যাতি 'হুতোম প্যাঁচার নকৃশা' প্রণয়নে। এই 'নকৃশা'র সামাজিক বা সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণ আমার অভিপ্রেত নয়। বাংলা গদ্যরীতিতে প্যারীচাদ মিত্র যে প্রবল আন্দোলন প্রবর্তন করেছিলেন, কালীপ্রসন্ন সিংহ তাতে বেগ সঞ্চার করেন। বঙ্কিমচন্দ্র টেকচাঁদী ভাষাকে যত প্রশংসা করেছেন, তা প্রাপ্য অপেক্ষা বেশি, আর হুতোমী ভাষার যে নিন্দা করেছেন, তাও অতিরিক্ত। তিনি বলেছেন, "হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই, হুতোমি ভাষা অসুন্দর, এবং যেখানে অশ্লীল নয় সেখানে পবিত্রতা-শূন্য। হুতোমি ভাষায় কখনও গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে।" (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫ সাল)।

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র একটি গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন। উপরোক্ত 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধেই তিনি বলেছেন : "যিনি যত চেষ্টা করেন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য

ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য-জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্ত সঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না।" ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র এই কথা বলেন। পর বৎসরেই 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে ও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। তারও অনেক পরে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ার কথ্যভাষাকে ভিত্তি করে শিষ্ট কথ্যভাষা 'সবুজপত্রে' প্রমথ চৌধুরী ব্যবহার করেন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র কালীপ্রসন্ন সিংহকে যে দোষে অভিযুক্ত করেছিলেন, সে দোষে তিনি কিশোর রবীন্দ্রনাথকেও অভিযুক্ত করতে পারতেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি তা করেন নি। অবশ্য পরবর্তীকালে বঙ্কিম-ভক্তেরা ও গোঁড়া সংস্কৃতবাদিরা প্রমথ চৌধুরীকে এই অভিযোগেই আক্রমণ করেছিলেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ ও প্যারীচাঁদ মিত্র কথ্যভাষাকে সাহিত্যের বাহন করতে চেয়েছিলেন। সেদিন তাঁরা সমর্থন পান নি, পরবর্তীকালের দুই প্রধান গদ্যশিল্পী তাদের আন্দোলনকে সমর্থন ও জয়যুক্ত করেছিলেন। সেখানেই টেকচাঁদ ও হুতোম প্যাঁচার বিদ্রোহ সার্থক।

প্যারীচাঁদ মিত্রের টেকচাঁদী ভাষা (যা আগের প্রবন্ধে আলোচনা করেছি) মিশ্র সাধুভাষা বা সংকর কথ্যভাষা। ক্রিয়াপদিক রূপে সাধু ও কথ্যরীতির মিশ্র ব্যবহার 'আলালের ঘরের দুলালে' অবিরল; যেমন, "ধেয়ে আইল", "চোক টিপ্‌তে লাগিলেন", "পেছিয়া", "কুঁতিয়া", প্রভৃতি। হুতোমি ভাষায় এই দোষ ছিল না। ব্যাকরণ-শুদ্ধ ছিল হুতোমি ভাষা। উনিশ শতকের মধ্যবিন্দুতে—আজ থেকে একশ বছর আগে কলকাতায় যে কথ্যভাষা প্রচলিত ছিল, তার অবিকৃত রূপ 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় পাওয়া যায়। এই অবিকৃত কথ্য-ভাষাকে শিষ্ট সাহিত্যিক কথ্যভাষায় পরিণত বা উন্নীত করার ক্ষমতা কালীপ্রসন্নের ছিল না, সে কাজ পরে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী করেন। বঙ্কিমের মতানুসারে হুতোমি-ভাষা দরিদ্র বা অসুন্দর হতে পারে, কিন্তু তা নিস্তেজ বা হতবল নয়। গভীর ভাব বহনের ক্ষমতা হুতোমি-ভাষার নেই, কিন্তু লঘু চিন্তা ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রকাশে এর কার্যক্ষমতা অসীম। অসংস্কৃত অশিষ্ট

কথ্যভাষা রূপে হুতোমি-ভাষা গদ্যেতিহাসে স্থান পাবে, কারণ এর পরের ধাপই শিষ্ট সাহিত্যিক কথ্যভাষা।

এবার হুতোমিভাষার খানিকটে উদাহরণ দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করি। "কলকেতা শহরের আমোদ শীগগির ফুরায় না, বারোইয়ারি-পূজার প্রতিমা-পূজা শেষ হলেও বারো দিন ফ্যালা হয় না। চড়কও বাসী, পচা গলা ধসা হয়ে থাকে—সে সব বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায় ও ক্রমে তেতো হয়ে পড়ে। সুতরাং টাটকা চড়ক টাট্‌কা-টাট্‌কাই শেষ করা গেল।"

"আর একবার ঝিলিপুরের দত্তরা সোঁদরবন আবাদ কত্তে কত্তে ত্রিশ হাত মাটির ভিতরে এক মহাপুরুষ দেখেছিল। তাঁর গায়ে বড় বড় অশোদগাছের শেকড় জন্মে গিয়েছিল। আর শরীর শুকিয়ে চেলাকাঠের মত হয়েছিল। দত্তরা অনেক পরিশ্রম করে তাঁরে ঝিলিপুরে আনে, মহাপুরুষও প্রায় এক মাস ঝিলিপুরে থাকেন, শেষে একদিন রাত্তিরে তিনি যে কোথায় চলে গেলেন, কেউ তার ঠিকানা কত্তে পাল্লে না।—শুনতে শুনতে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।"

"সাতপেয়ে গরু বাজারে ঘর ভাড়া বল্লেন, দর্শনী দু পয়সা রেট হলো; গরু রাখবার জন্য অনেক গরু একত্র হলো। রাকি গরুদের ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকা হতে লাগলো, কিছু দিনের মধ্যে সাতপেয়ে গরু বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার করে দেশে গেলেন।"

এখানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ঠিকরে বেরুচ্ছে। ভাষার এই স্বচ্ছন্দ গতি চকমকি-সুলভ ঔজ্জ্বল্যই হুতোমি-ভাষার প্রাণ।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

গদ্যের ভাষা কাজের ভাষা, বৈজ্ঞানিক মানসের বাহন, গুরু চিন্তাভার বহনে সক্ষম, দুরূহ তত্ত্ব প্রকাশে সমর্থ। এই ভাষা বুদ্ধি ও যুক্তির ভাষা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভাষা। ভাব ও আবেগের ভাষা কাব্যের ভাষা, কিন্তু আদর্শ গদ্যে তার ঠাঁই নেই। গদ্যের ভাষার প্রধান গুণ স্বচ্ছতা, প্রাঞ্জলতা। ইংরেজিতে এই গুণকে বলে clarity, সংস্কৃতে প্রসাদগুণ। ফরাসি গদ্য ও আঠারো শতকী ইংরেজী গদ্যের লক্ষ্য ছিল এই স্বচ্ছতা। এই গুণ না থাকলে গদ্যের লঘু বা সরস, গম্ভীর বা ধীর চালের কথা ওঠে না।

বাংলা গদ্যের ভাষায় এই গুণের বহুল চর্চা হয়েছিল গত শতকে। অধুনা এই চর্চা বিরল হয়ে এসেছে। যে গদ্য যুক্তি-তর্ক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন, তার চর্চা গত শতকে যাঁরা করেছিলেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) তাঁদের অন্যতম। বাংলা গদ্যে ক্লাসিক্যাল সাহিত্যরূপটি আবিষ্কার করেন বিদ্যাসাগর—বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত ছন্দ ও ধ্বনিরোল তার কানেই প্রথম ধরা পড়ে। পরবর্তী গদ্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র তার উপন্যাসগুলিতে এই অলঙ্কারসমৃদ্ধ ধ্বনিরোলমুখরিত বিদ্যাসাগরী গদ্যই (সাবলীল ও সবলতর রূপে) ব্যবহার করেন তবে বঙ্কিমের নিজস্ব গদ্যরীতি দেখা গেছে তাঁর প্রবন্ধাবলীতে—তা এই 'কাজের গদ্য', স্বচ্ছ যুক্তি ও স্বচ্ছ ভাষার গদ্য প্রসাদগুণবিশিষ্ট প্রাঞ্জল গদ্য। 'কৃষ্ণচরিত্র', 'লোকরহস্য', 'বাঙ্গলার কৃষক' প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থের যে গদ্য, তা-ই আদর্শ গদ্য। এই গদ্য আমাদের বৈজ্ঞানিক মানসের ও দুরূহ দর্শন-সাহিত্য-তত্ত্বচিন্তার ভার বহনে সক্ষম। এই গদ্যের চর্চা আজ তাই অপরিহার্য। এই ক্ষেত্রে বঙ্কিমের পূর্ববর্তী গদ্যশিল্পী হলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিম ও বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীর হাতে যে আদর্শ প্রাঞ্জল স্বচ্ছ প্রসাদগুণবিশিষ্ট গদ্যের চর্চা হয়েছিল, তার পত্তন হয়েছিল ভূদেবের হাতে। বস্তুত আজকের দিনে ভূদেবের গদ্যের বহুলচর্চা দ্বারা দুরূহ ও জটিল চিন্তারাজি প্রকাশে আমরা সক্ষম হবো বলে আমার ধারণা।

ভূদেব প্রাক্-বঙ্কিম যুগের গদ্যলেখক। এই কথাটি মনে রাখলে ভূদেবের

কৃতিত্ব পরিমাপ করা সহজ হবে। তিনি দুটি সংবাদপত্র সম্পাদনা ও পরিচালনা করেন: 'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার' (১৮৬৪) এবং 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ' (১৮৬৮)। এই দুই মাসিকপত্রে ভূদেবের অধিকাংশ লেখা প্রথম প্রচারিত হয়। শেষোক্ত পত্র সেদিন সর্বোৎকৃষ্ট পত্রে পরিণত হয়েছিল। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ভূদেবের মূল্যবান প্রবন্ধ-সমূহ সাংবাদিকসুলভ অগভীর রচনায় পর্যবসিত হয় নি, সেগুলির আবেদন স্থায়ী ও সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সাংবাদিকতা ও সাহিত্য: এ দুয়ের সংকীর্ণ সীমান্তপ্রদেশে যাতায়াতের বিরল নৈপুণ্য তাঁর ছিল। তাই ভূদেব কেবল সাংবাদিক নন, তিনি সাহিত্যকারও বটেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত তালিকায় পাই, ভূদেবের জীবনকালে দশটি ও মৃত্যুর পর পাঁচটি, একুনে পনেরটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ভূদেবের যে স্বকীয় গদ্যরীতি তার প্রকাশ সব ক'টি গ্রন্থে নেই। তার জন্য আমাদের এই গ্রন্থগুলি দেখা প্রয়োজন: (১) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (১৮৫৯), (২) পারিবারিক প্রবন্ধ (১৮৮২), (৩) সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২) (৪) আচার প্রবন্ধ (১৮৯৫), (৫) বিবিধ প্রবন্ধ (১মঃ ১৮৯৫, ২য়ঃ ১৯০৫), (৬) স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৯৫) ও (৭) বাঙ্গলার ইতিহাস (৩য়ঃ ১৯০৪)।

যুক্তি ও জ্ঞানের গদ্য, ভাবুকতা ও উচ্ছ্বাসবিহীন অথচ সাহিত্যগুণযুক্ত গদ্য প্রসাদগুণবিশিষ্ট স্বচ্ছ প্রাঞ্জল গদ্যের স্রষ্টা বলে ভূদেবকে আমরা মনে রাখি। বঙ্কিমের বিপুল কীর্তি সত্ত্বেও ভূদেবের কৃতিত্ব খর্ব হয় না। বঙ্কিম-পূর্ববর্তী-গদ্যলেখক ভূদেব পরবর্তী সকল গদ্যলেখকের উপর প্রভাব বিস্তার করে গেছেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোচনায় ভূদেবের গদ্যরীতি সবাই গ্রহণ করেছেন। এখানেই ভূদেবের গদ্যরীতির সার্থকতা।

এইবার ভূদেবের এই গদ্যের কিছু নমুনা আহরণ করা যাক্।

দুরূহ বিজ্ঞানালোচনায় ভূদেব যে দক্ষতা দেখিয়েছেন, তা পরবর্তী বিজ্ঞান-প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ও পূর্ববর্তী অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলালের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই ধরণের আলোচনায় যে নৈর্ব্যক্তিকতা ও নিরাসক্তি

যুক্তিপ্রবণতা ভাবাবেগরাহিত্য প্রয়োজন, তা ভূদেবের ছিল। তার প্রমাণ 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' গ্রন্থের নিম্নধৃত অণুচ্ছেদটি ঃ

"বস্তুতঃ পরমাণুর উৎপত্তিও নাই, বিনাশ নাই। যে দ্রব্য মাটিতে পড়িয়া পচিতেছে তাহার পরমাণু সমস্ত কতক বায়ুতে আর কতক পৃথিবীতে থাকে। আবার সেই সকল পরমাণুই সংযুক্ত হইয়া অন্য দ্রব্যে মিশ্রিত হয়। যে স্থলে শবদাহ হয় সেই স্থানের মৃত্তিকাতে ঐ শব শরীরের কতক পরমাণু থাকে—ঐ স্থানে যে উদ্ভিজ্জ জন্মে তাহার মূল দ্বারা ঐ সকল পরমাণু কতক উঠিয়া আইসে, এবং তদ্দ্বাবা উদ্ভিজ্জ-শরীর পুষ্ট হয়; সেই উদ্ভিজ্জ ভক্ষণ দ্বারা যে পশু স্বীয় দেহ রক্ষা করে, তাহার শরীরেও ঐ পরমাণু প্রবিষ্ট হয়। আবার সে মরিলে ঐ সকল পরমাণু অন্য নানা প্রকারে অপব প্রাণিশরীরে আসিয়া থাকে। জগতে অনুক্ষণ এইরূপই হইতেছে।"

সমাজ ও সংসার সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধগুলিতে দেখি ভূদেবের গদ্যরীতি আরো স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল, গতিশীল ও সাবলীল হয়েছে। তার উদাহরণ 'পারিবারিক প্রবন্ধ' থেকে ঃ

"পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা এক পদার্থ নয়—কিন্তু প্রায়ই এক। যে পুরুষ বা স্ত্রী বাহ্যদর্শনে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন, সে-ই যে অন্তরেও বিশুদ্ধ এবং সুব্যবস্থিত হয়, এরূপ নহে; কিন্তু যাহার মন বিশুদ্ধ এবং পরিপাটী, তাহাকে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন অবশ্যই হইতে হয়। বাহ্যব্যাপার সমস্তকে হেয় জ্ঞান করা আমাদিগেব ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপয্য না বুঝিবারই ফল। পৃথিবী কিছু নয়—শরীর কিছু নয়—সংসার কিছু নয়—এ সকলের প্রতি যত্ন এবং আদর করা ক্ষুদ্রাশয়তার লক্ষণ, শাস্ত্রে এরূপ কথা আছে বটে, কিন্তু দেহ এবং গৃহস্থিত সমুদায় সামগ্রী সুবিশুদ্ধ এবং সুপরিষ্কৃত রাখিবার অবশ্য কর্ত্তব্যতাও শাস্ত্রে যথোচিত পরিমাণে উল্লিখিত আছে। গৃহের এবং গৃহস্থিত দ্রব্যের যথোচিত বিলেপন ও সম্মার্জ্জনাদি, স্নান, ভোজন, আচমন, বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তন প্রভৃতি ব্যাপার আমাদিগের অবশ্য করণীয় প্রাত্যহিক কার্য্যের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট। বিশেষতঃ গৃহস্থের বাটীতে দেববিগ্রহ ও ঠাকুরঘর রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া সকল গৃহস্থেরই শুচিতার এবং পরিচ্ছন্নতার এক একটি আদর্শ পাইবার উপায় করা হইয়াছে।

ঠাকুরঘর যে ভাবে রাখ, আবাসের সকল ঘর সেইভাবে রাখিলেই হইল। পিতা মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের ঘর এবং মহাগুরু স্বামীর ঘর কি ঠাকুরঘর নয়?"

এখানে ছোট ছোট বাক্যে ও তদ্ভব শব্দ-ক্রিয়ার প্রয়োগে সমগ্র গদ্যরীতিতেই একটি সাবলীল গতি অনুভব করা যায়। ভাবোচ্ছ্বাসের ও অনাবশ্যক শব্দের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি এই গদ্যরীতির বিশিষ্ট লক্ষণ। 'আচার প্রবন্ধ' থেকে গৃহীত নিম্নধৃত অংশেও এই বৈশিষ্ট্য বর্তমান:

"মনুষ্যে পশুধর্ম্ম এবং জড়ধর্ম্ম দুই-ই আছে। পশুধর্ম্ম হইতে স্বেচ্ছাচার জন্মে। যখন যাহা করিতে ইচ্ছা হইল তখনই তাহা করিতে প্রবৃত্তি হওয়া, তাহার ফলাফল বিচার না করা, পশুর ধর্ম্ম। ঐ পশু-ভাবের ন্যূনতা সাধন আমাদিগের শাস্ত্রের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রের অভিপ্রায়, মানুষ আপন উদ্দেশ্যের স্থিরতা, মনোযোগের ঐকান্তিকতা, চিত্তের প্রশস্ততা, এবং শরীরের পটুতা সম্বর্দ্ধন সহকারে সকল কাজ করেন। খাবার সামগ্রী দেখিলেই খাইলাম, শয়নের ইচ্ছা হইলেই শুইলাম, ক্রোধাদির প্রবৃত্তি হইলেই তদনুযায়ী কার্য্য করিলাম, এইরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার আর্য্যশাস্ত্রের বিগর্হিত। এগুলির নিবারণ শাস্ত্রাচারের সুপালন ভিন্ন আর কোন প্রকারেই সুন্দররূপে সিদ্ধ হয় না। শাস্ত্রাচারের পালনেই সত্ত্বগুণের সম্বর্দ্ধন হইয়া ঐ সকল রজোগুণ-সম্ভূত দোষের পরিহার হইতে পারে।"

আরেকটি উদাহরণ দিয়ে ভূদেব-গদ্যরীতির আলোচনা শেষ করছি। এই উদাহরণটি ভূদেবের 'মৃচ্ছকটিক' শীর্ষক প্রবন্ধ (এডুকেশন গেজেট, ১৮৮৭; 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এ সঙ্কলিত) থেকে গৃহীত। এখানে হ্রস্ব বাক্য, তদ্ভব শব্দের বহুল প্রয়োগ ও বর্ণনার ক্ষিপ্রচারিতা লক্ষণীয়। নাট্যসমালোচনা অথচ উচ্ছ্বাসবিহীন এই প্রবন্ধ ভূদেব-গদ্যরীতির সুন্দর পরিচয়স্থল:

"মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত দরিদ্র দশায় পতিত এবং আর্য্য শাস্ত্রের শিক্ষাগুণে সর্ব্বতোভাবে উদারচেতা এবং স্বধর্মনিষ্ঠ হইয়া প্রদর্শিত হইলে রঙ্গ-ভূমিতে নায়িকা বসন্তসেনার অবতরণ আরম্ভ হইল। এই নায়িকার চরিত্রে একটু বিশেষ বৈচিত্র্য আছে। এই বৈচিত্র্যটি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে হইলে

সমাজচিত্রই পরিষ্কাররূপে বুঝিবার প্রয়োজন হয়; এবং তাহা হয় বলিয়াই সমাজচিত্রাঙ্কনে কৃতসঙ্কল্প মৃচ্ছকটিক রচয়িতার তাদৃশ নায়িকা লইয়াই নাটক রচনা।

বসন্তসেনা একটি গণিকা। সে বহুল ধনশালিনী। তাহার বাটী আট মহল। সে বাটীর তোরণ-দ্বার অতি উচ্চ। বাটীর ভিতরে কত পুষ্পোদ্যান; দীর্ঘিকা, কত রত্নবেদী, কত রত্নস্তম্ভ, কত গোরু, হাতী, ঘোড়া, কত লোকজন, কত কত দাস দাসী, কত পড়ুয়া পণ্ডিত, কত গান বাদ্য, কত রঙ্গরস। তাহার বাটীর বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে শিল্পনৈপুণ্যের, কলাবিদ্যানুশীলনের, এবং বিভব-শালিতার বিলক্ষণ আতিশয্য অনুভূত হয়। বসন্তসেনা যে উজ্জয়িনী নগরে বাস করিতেন, সেই নগরের সর্ব্বপ্রধান শোভা বলিয়াই নাগরিকেরা তাঁহার উল্লেখ করিত। তিনি যেমন ধনবতী তেমনি মাননীয়াও ছিলেন।"

উপরোক্ত উদাহরণগুলি থেকে ভূদেবের স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল, সাবলীল ও ক্ষিপ্রচারী গদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দুরূহ শাস্ত্রতত্ত্ব, বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাসচিন্তা অথবা সাহিত্যসমালোচনায় ভূদেব অনায়াস-নৈপুণ্যে এই প্রসাদগুণসমন্বিত গদ্য ব্যবহার করে' সমান সাফল্য অর্জন করেছেন। clarity বা স্বচ্ছতা, ভূদেব-গদ্যরীতির প্রথম ও শেষ কথা। আমরা এই গদ্যরীতির চর্চা করলে লাভবান হবো বলে আমি বিশ্বাস করি।

বঙ্কিমচন্দ্র

'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ গদ্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "যিনি ঈশ্বর গুপ্তের আসরে প্রথম হাত পাকাচ্ছিলেন অত্যন্ত আড়ষ্ট বাংলা ভাষায়, সেই ভাষারই বন্ধন মোচন করেছিলেন সেই বঙ্কিম। তিনিই তাকে দিয়েছিলেন চলবার স্বাধীনতা।" (পৃঃ ৪৫)

যে বাংলা গদ্য রামমোহনের হাতে তর্কসভার উপযোগী হয়ে উঠল, অক্ষয় কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে সরল ও প্রাঞ্জল হ'ল, বিদ্যাসাগরের হাতে তা গ্রাম্যবর্বরতা ও দুঃসাধ্য পাণ্ডিত্যের কবলমুক্ত সাহিত্যিক গদ্যে পরিণত হল। বঙ্কিমচন্দ্র পূর্বসূরীদের এই ভিত্তির উপর ভাষাসৌধ নির্মাণ করলেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, "তাঁর আগে ভাষার মধ্যে অসাড়তা ছিল ; তিনি জাগিয়ে দেওয়াতে তার যেন স্পর্শ বোধ গেল বেড়ে। নতুন কালের নানা আহ্বানে সে সাড়া দিতে সুরু করল। অল্পকালের মধ্যেই আপন শক্তির সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠল। বঙ্গদর্শনের পূর্বকার ভাষা আর পরের ভাষা তুলনা করে দেখলে বোঝা যায়, একপ্রান্তে একটা বড়ো মনের নাড়া খেলে দেশের সমস্ত মনে ঢেউ খেলিয়ে যায় কত দ্রুতবেগে, আর তখনি তখনি তার ভাষা কেমন করে নতুন নতুন প্রণালীর মধ্যে আপন পথ ছুটিয়ে চলে।" ('বাংলাভাষা-পরিচয়', পৃঃ ৩৩)

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল বাংলা গদ্যের এই রূপান্তর সাধনের জন্য বাঙালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন তা নয়, তিনি সাধু গদ্যের নোতুন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে দেবার জন্যও আমাদের উত্তমর্ণ হয়ে রইলেন। সে আলোচনার আগে বাংলা গদ্য সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা কী ছিল, তা জানা প্রয়োজন।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় তাতে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলা গদ্যের আলোচনায় এই সব তারিখ ও প্রকাশনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক্-বঙ্গদর্শন-পর্বের গদ্য ও বঙ্গদর্শন-পর্বের গদ্য—বঙ্কিমের এই দুই গদ্যরূপের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য আছে। প্রথমোক্ত পর্বের গদ্য মূলতঃ সংস্কৃতানুসারী—

বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে বিদ্যাসাগর ও তারাশঙ্কর তর্করত্নের অনুবর্তী। বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তিনটি উপন্যাস লেখেন—'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯)। এই তিনটি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে গদ্য ব্যবহার করেছেন, তা মূলতঃ বিদ্যাসাগরী গদ্য। তবে 'কপালকুণ্ডলা'র ভাষা অপর দুটি উপন্যাসের ভাষা অপেক্ষা উন্নত, সাবলীল ও সরস। এই তিনটি উপন্যাসের গদ্যে বিদ্যাসাগরী গদ্যের লক্ষণগুলি প্রকট। যেমন, "তৎসম শব্দের প্রচুর ব্যবহার, সমাসের আড়ম্বর, বিশেষণপদে স্ত্রীপ্রত্যয়ের আধিক্য, সংস্কৃতরীতি অনুযায়ী বাক্যগঠন" ইত্যাদি। (ডঃ সুকুমার সেন, 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য', পৃঃ ১০৫-০৬)।

'দুর্গেশনন্দিনী'র সূচনায় যে গদ্য প্রযুক্ত হয়েছে, তা উপরোক্ত মন্তব্যকে সমর্থন করে ঃ "৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেন না, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর, কি জানি যদি কালধর্ম্মে প্রদোষ-কালে প্রবল ঝটিকাবৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল ; ক্রমে নৈশগগন নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমত ঘোরতর অন্ধকার দিগন্ত-সংস্থিত হইল যে অশ্বচালনা অতি কঠিন হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তি-প্রদর্শিত পথে কোনমতে চলিতে লাগিলেন।"

'মৃণালিনী' উপন্যাসের গদ্যও ঠিক এই পথেই চলেছে। এর সূচনায় লেখক বলছেন ঃ "একদিন প্রয়াগতীর্থে, গঙ্গা যমুনা-সঙ্গমে অপূর্ব্ব প্রাবৃট্-দিগন্তশোভা প্রকটিত হইতেছিল। প্রাবৃট্‌কাল, কিন্তু মেঘ নাই, অথবা যে মেঘ আছে, তাহা স্বর্ণময় তরঙ্গমালাবৎ পশ্চিম-গগনে বিরাজ করিতেছিল। সূর্য্যদেব অস্তে গমন করিয়াছিলেন। বর্ষার জলসঞ্চারে গঙ্গাযমুনা উভয়েই সম্পূর্ণশরীরা, যৌবনের পরিপূর্ণতায় উন্মাদিনী, যেন দুই ভগিনী ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পরে আলিঙ্গন করিতেছিল। চঞ্চল বসনাগ্রভাগবৎ তরঙ্গমালা পবন তাড়িত হইয়া কূলে প্রতিঘাত হইতেছিল।"

এই দুই উদাহরণ বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' ও 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'র গদ্যের সমধর্মী। প্রাক্-বঙ্গদর্শন-পর্বে বঙ্কিমের গদ্যের সাবলীল ও কাব্যসুষমামণ্ডিত পরিচয় পেতে হলে আমাদের 'কপালকুণ্ডলা'র ভাষা চর্চা করা প্রয়োজন। বিদ্যাসাগরী-গদ্য ভাষাশিল্পীর হাতে পড়লে যে কত সাবলীল ও প্রখর, দ্রুততর ও অন্তরঙ্গ হতে পারে, তার চরম উদাহরণ 'কপালকুণ্ডলা'র ভাষা। এর একটু উদাহরণ দিই : "মনের চাঞ্চল্যহেতু নবকুমার একস্থানে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁর ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিলেন ; ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল,—যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে সর্ব্বত্র জনহীন,—আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্ব্বত্র নীরব, কেবল অবিরল-কল্লোলিত সমুদ্র-গর্জ্জন, আর কদাচিৎ বন্যপশুর রব। তথাপি নবকুমার সেই অন্ধকারে, শীতবর্ষী আকাশতলে বালুকাস্তূপের চতুষ্পার্শে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখন উপত্যকায়, কখন অধিত্যকায়, কখন স্তূপতলে, কখন স্তূপ-শিখরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।"

এর পর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রকাশ ও তার পাতায় 'বিষবৃক্ষে'র পত্তন। প্রথম তিনটি উপন্যাস লিখে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়েছিলেন বলে মনে করা যেতে পারে। তাঁর সামনে দুটি পথ খোলা ছিল—একটি পথে বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' ও তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী' ; অপর পথে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' ও প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'। পত্রিকা-প্রকাশের সংকল্প তিনি যখন করলেন, তখন ভাষাপথের সমস্যা দেখা দিল। এই দুই পথের কোন্ পথে, অথবা অন্য কোনো পথে তিনি যাবেন—এই প্রশ্নের সমাধান সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে ছিলেন নিঃসঙ্গ। 'ভাষাপথ খনিয়া স্ববলে' তিনি নিজস্ব পথ কেটে নিয়ে এগিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল—সাধারণ পাঠকের বোধগম্যতা। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১২৭৯ ; এপ্রিল ১৮৭২) বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন : "আমরা কৃতবিদ্যদিগের মনোরঞ্জনার্থ যত্ন পাইব বলিয়া কেহ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা আপামর-সাধারণের পাঠোপযোগিতা

সাধনে মনোযোগ করিব না। যাহাতে এই পত্র সর্ব্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছি। যদি এই পত্রের দ্বারা সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন সংকল্প না করিতাম, তবে এই পত্র প্রকাশ বৃথা কার্য্য মনে করিতাম।" এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শনকে সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন এবং তাঁর ভাষাও সহজবোধগম্য হবে, এটাই স্বাভাবিক।

বঙ্গদর্শন পত্রিকায় তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেন, সে সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিমত তিনি ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় বলেন নি, ১২৮৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বলেছিলেন। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে এই ভাষার প্রথম প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্র যে সচেতন ভাষাশিল্পী, গদ্যনির্মাতা, অগ্রসর গদ্যলেখক, তার প্রমাণ "বাংলা ভাষা" প্রবন্ধটি (১২৮৫ জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত)। সমসাময়িক অবস্থা পর্যালোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন: "যাঁহারা ইংরেজিতে পণ্ডিত, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে না জানা গৌরবের মধ্যে গণ্য করিতেন, সুতরাং বাঙ্গালায় রচনা ফোঁটা-কাটা অনুস্বারবাদিদগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাঁহাদিগের গৌরব। তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব। যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা থাকুক, না থাকুক, ওজনে ভারী সোনা পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক্ বা না হউক্, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত-বাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল। এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গাল সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত, ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ন করিলেন। সেইদিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেইদিন হইতে শুষ্কতরুমূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।"

এই আলোচনায় আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের আশ্চর্য সংস্কার-মুক্তি ও প্রগতিশীলতা লক্ষ্য করি—অভ্যস্ত সংস্কারকে ত্যাগ করে যাবার সাহস সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন। তিনি এখানেই ক্ষান্ত হন নি। এরপর তিনি বলেছেন, হুতোমি-ভাষা ও আলালী ভাষা গতানুগতিকতা ও সংস্কৃতানুকারিতা থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছে। এর জন্য তা অবশ্যই প্রশংসার্হ, কিন্তু এদের প্রয়োজন এখানেই ফুরিয়েছে। হুতোমি ভাষা ও আলালী ভাষা 'দরিদ্র, নিস্তেজ, অপরিমার্জ্জিত'। তাহলে আমরা কোন্ পথে যাব? বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: "যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য সামান্য-জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন।" এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষা বা আলালী-ভাষায় সিদ্ধ হতে পারে না। "অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।" রচনার দুটি গুণ বঙ্কিমচন্দ্র নির্ধারণ করেছেন—সরলতা ও স্পষ্টতা, এবং সৌন্দর্য-সাধন। এর জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করতে চেয়েছেন এবং যেখান থেকেই তা আনা হোক না কেন, তাতে তাঁর আপত্তি নেই। "যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবী, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তারপর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে।" লঘু বা গুরু বাগ্‌ভঙ্গী, সরল বাংলা বা সংস্কৃতবহুল বাংলার "প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে, ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্য্যে পুষ্টা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।"

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজন ছিল। ভাষার ক্ষেত্রে বঙ্কিমের আশ্চর্য সংস্কারমুক্তি ও উদারতা, প্রগতিশীলতা ও নূতনকে বরণেচ্ছার এই পরিচয় বঙ্কিমের ভাষাশিল্পী-রূপটিকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করেছে। তাঁর নোতুন রীতির বাংলা গদ্যের একটু পরিচয় 'বিষবৃক্ষ' থেকে দিই। এই উপন্যাসের আরম্ভটি

বড় সুন্দর—ভাষা বেগবতী ও সরল—নদীস্রোতের সঙ্গে ভাষাস্রোতও যেন ভরা আনন্দে ছুটে চলেছেঃ "নগেন্দ্র দত্ত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন। জ্যৈষ্ঠমাস তুফানের সময়, ভার্য্যা সূর্য্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, "দেখিও, নৌকা সাবধানে লইয়া যাইও, তুফান দেখিলে লাগাইও। ঝড়ের সময় কখনো নৌকায় থাকিও না।...প্রথম দুই একদিন নির্ব্বিঘ্নে গেল। নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে গেলেন, নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্ত্তে ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত—অনন্ত—ক্রীড়াময়।......নগেন্দ্র প্রথম দুই একদিন দেখিতে দেখিতে গেলেন। পরে একদিন আকাশে মেঘ উঠিল, নদীর জল কালো হইল, গাছের মাথা কটা হইল, মেঘের কোলে বক উড়িল, নদী নিস্পন্দ হইল।" ক্রিয়াপদের লঘুতা, হ্রস্ব বাক্য, অনলংকৃত বিবৃতি, দ্রুত লয়ের বাগ্‌ভঙ্গী—এ সবই নোতুন। প্রাক-বঙ্গদর্শন পর্বে এই সব লক্ষণ দেখা যায়নি। এই বর্ণনার সঙ্গে তুলনা করুন 'কপালকুণ্ডলা'র রসুলপুরের নদীর বর্ণনা বা 'দুর্গেশনন্দিনা'র নিদাঘ ঝটিকার বর্ণনা। পরিবর্তন সহজেই চোখে পড়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র এখানেই থেমে যান নি, তিনি আরো এগিয়েছেন। বাংলাভাষায় কেবল কাব্যধর্মী গদ্যের লেখক হিসেবে নয়, যুক্তিপন্থী গদ্যের লেখক রূপেও বঙ্কিমচন্দ্র সম্মানিত স্থান অধিকার করে আছেন।

গদ্যরাজ্যে দুই ধরণের গদ্য আছে—যুক্তিপন্থী গদ্য, যা মননপ্রধান প্রবন্ধের বাহন, আর কাব্যধর্মী গদ্য, যা গল্প উপন্যাসের বাহন। গদ্যরাজ্যে এ দুয়েরই ঠাঁই আছে। আঠারো শতকের ইংরেজি গদ্য লেখক মূলতঃ যুক্তিপন্থী ভাবসহ দৃঢ়বদ্ধ সুশৃঙ্খল গদ্য-রচনা করেন। জন্ বানিয়ান্, উইলিয়ম টেম্পল্, হ্যালিফাক্স, ড্রাইডেন, লক্, ডিফো, স্টীল্, সুইফট, এ্যাডিসন্, বার্কলে যুক্তিবাহী গদ্যকে সমৃদ্ধ করেন। উনিশ শতকের ইংরেজ লেখকরা প্রধানত ভাবপ্রধান আদর্শবাদী কাব্যগুণসমৃদ্ধ গদ্য রচনা করেন। কার্লাইল্, ইমার্সন্, থোরো হ্যাজ্‌লিট, ডি কুইন্সি, রাস্কিন্, স্টিভেন্‌সন্ প্রমুখ লেখকরা এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ অলংকারসমৃদ্ধ ভাবাবেগবাহী গদ্য রচনা করে যশস্বী হন। বিশ শতকের ইংরেজ গদ্যকার তাই নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে থেকে গদ্যচর্চা করেন।

বাংলা গদ্যের এইরকম সুদীর্ঘ বৈচিত্র্যপূর্ণ সমৃদ্ধ ইতিহাস নেই। বাংলা গদ্যের ভিত্তিভূমি দৃঢ়বদ্ধ না হতেই তার ওপর দিয়ে ভাবের বান বয়ে গেছে। ফলে ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ মনীষা-বলে একথা বুঝেছিলেন, কেবল কাব্যধর্মী অলংকৃত গদ্যচর্চা করলে গদ্যের উন্নতি ঘটে না, চিন্তা অগ্রসর হয় না, সাহিত্য পেছিয়ে যায়। তাই তিনি তাঁর প্রবন্ধে স্বতন্ত্র রীতির গদ্য ব্যবহার করেছেন। যুক্তিনিষ্ঠ অলংকারবর্জিত ভাবাবেগহীন বৈজ্ঞানিক সত্য-দিদৃক্ষাসম্পন্ন ভারবাহী টেকসই বাংলা গদ্যের প্রয়োজনীয়তা তিনি বুঝেছিলেন বলেই একে অবহেলা করেন নি। ম্যাথু আর্নল্ড্ বলেছেন, "The needful qualities for a fit prose are regularity, uniformity, precision and balance।" এই গুণগুলির চর্চা বঙ্কিম-প্রবন্ধ-সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসাবলী, ও 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বঙ্কিমচন্দ্র কাব্য-ধর্মী গদ্যের চর্চা করেছেন, কিন্তু প্রবন্ধ সাহিত্যে তিনি যুক্তিধর্মী গদ্যচর্চা করেছেন। সেখানে তিনি রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহযাত্রী। বঙ্কিমচন্দ্র তাই একাধারে ড্রাইডেন ও কার্লাইল্, এ্যাডিসন্ ও ইমার্সন্, সুইফট্ ও হ্যাজলিট্। দুই জাতের গদ্যের চর্চা তিনি একাই করেছেন। 'কপালকুণ্ডলা'র কাব্যধর্মী গদ্য ও 'কৃষ্ণচরিত্রে'র যুক্তিধর্মী গদ্য—এ দুয়ের কোথাও মিল নেই। এ দুয়ের যোগসূত্র বঙ্কিমচন্দ্র। তর্কের ভাষা, যুক্তির ভাষা, তত্ত্ব-প্রতিপাদনের ভাষা, দুরূহ বিজ্ঞান-চিন্তা ও দর্শন-চিন্তা-ব্যাখ্যার ভাষার সযত্ন চর্চা বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'লোকরহস্য', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব', 'সাম্য', 'বিজ্ঞানরহস্য' প্রভৃতি প্রবন্ধ-গ্রন্থে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামদাস সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্কিমের এই ধারার অনুসারী।

সুতরাং যথার্থ গদ্যনির্মাতা (Maker of Prose) আখ্যায় আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে ভূষিত করতে পারি।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

ঊনিশ শতকের বাংলা গদ্যে যে মহৎ সম্ভাবনা দেখা গেছিল, তা বিশ শতকে ফলবতী হয় নি, পরন্তু ব্যর্থ হয়ে গেছে। গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী গদ্যলেখকের রচনায় যে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সংযম লক্ষ্য করা যায়, তা বর্তমান শতকের গদ্যলেখকদের হাতে ঈপ্সিত পরিণতি লাভ করে নি। এই পটভূমিতে কালীপ্রসন্ন ঘোষের মতো গদ্যলেখকের রচনারীতি বা স্টাইল সম্পর্কে আলোচনার দ্বারা যদি সাম্প্রতিক গদ্যচর্চার শিথিলতা, অযত্ন ও আয়াস-বিমুখতা কাটিয়ে উঠতে পারি, তাহলে আমরা লাভবান হবো।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩—১৯১১) ঊনিশ শতকের বাংলা গদ্যনির্মাতাদের অন্যতম ছিলেন। কেবল গদ্যলেখক বললে এঁদের যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হয় না, এই নির্মাতাবৃন্দ সযত্ন অনুশীলন ও আন্তরিক অনুরাগ দিয়ে বাংলা গদ্যের চর্চা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এঁদের নেতা। 'বঙ্গদর্শন' লেখকগোষ্ঠী গত শতকের বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য দায়ী। 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) সে যুগের প্রতিভার বাহন ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, রামদাস সেন, পূর্ণচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার—এঁরা সকলেই 'বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। গুরুতর তত্ত্বালোচনা ও কাব্যধর্মী হৃদয়োচ্ছ্বাস —মূলতঃ এই দুই ধারায় দুই বিশিষ্ট রীতির গদ্যে এঁরা বহু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সেদিনের কলকাতায় বাঙালীর এই মহৎ গদ্যসাধনা কেবল 'বঙ্গদর্শন' মারফৎ প্রচার লাভ করে নি, যুগপৎ 'সাহিত্য', 'প্রচার', 'সাধারণী', 'নবজীবন' প্রভৃতি পত্রিকা মারফৎ প্রকাশ লাভ করেছিল।

এই সময়ে কলকাতা থেকে দূরে থেকেও—'বঙ্গদর্শন'-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হয়েও কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাংলা গদ্যের চর্চা করেছিলেন। ঢাকা শহরে বসেই তিনি সাহিত্যচর্চা করেন। তিনি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'বান্ধব' পত্রিকা ও ১৯০১

খৃষ্টাব্দে নবপর্যায় 'বান্ধব' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাতেই তাঁর প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়, পরে তা 'প্রভাতচিন্তা' (১৮৭৭), 'নিভৃতচিন্তা' (১৮৮২), 'নিশীথ-চিন্তা' (১৮৯৭) গ্রন্থে গ্রথিত হয়।

কালীপ্রসন্নকে 'গদ্যনির্মাতা' অভিধায় ভূষিত করেছি। এই অভিধার ব্যাখ্যা আবশ্যক। গদ্যরচনায় তাঁর প্রধান গুণ এই বিশেষণে নিহিত আছে। তাঁর গদ্যরচনায় সযত্ন আয়াস ও শ্রমশীলতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি গদ্যরচনাকে সহজ মনে করেন নি। তাঁর লিরিক্‌ধর্মী গদ্য শ্রমলব্ধ নিপুণতা ও আয়াসের ফল।

যদিও কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁর গ্রন্থের 'নিভৃতচিন্তা' বা 'প্রভাতচিন্তা' নাম দিয়েছেন, তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, তা সবব ফেনায়িত চিন্তা। উপবোক্ত গ্রন্থত্রয়ে শুধু যে লেখকের চিন্তা রয়েছে তা নয়, অনুভূতিও আছে। এগুলির মধ্যে মনস্বিতা আছে, কবিত্ব আছে। আবার সযত্ন মণ্ডনচাতুর্যও আছে। অনেক সময়ই মনে হয়, মণ্ডন শিল্পের (Decorative Art) প্রখর দীপ্তিতে তাব অনুভূতির মৃদু আলোক বুঝি ম্লান হয়ে যায়। বস্তুতঃ তাই ঘটেছে। তাঁর অনুভূতিতে গভীরতা, প্রশান্তি ও স্থৈর্যের অভাব ছিল। কিন্তু সে অভাব তিনি পূরণ করেছেন সযত্নগ্রথিত শব্দাবলী, নিপুণভাবে গঠিত গুরুবাক্য ও শ্রম-সাধ্য মণ্ডনচাতুর্যের দ্বারা।

কালীপ্রসন্নের গদ্য তাই আড়ম্বরপূর্ণ গদ্য—অলংকৃতা রমণীর মতো তার গর্বিত পদক্ষেপ। তাঁর গদ্যের চলন ভারী; শব্দৈশ্বর্যের ঝিকিমিকি, অলং-কারের রিণিঝিনি, সযত্নরচিত বিশেষণের কিরণ-বিচ্ছুরণ প্রায়শই ঘটে। কালীপ্রসন্ন তাঁর গদ্যকে বহু যত্নে ও পরিশ্রমে সাজিয়েছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা বিলক্ষণ জানতেন; কার্লাইল্ ও ইমার্সনের সচেতন অনুরাগী ছিলেন। ফলে তাঁর গদ্যে তৎসম শব্দের ধ্বনিরোল ও ঝঙ্কার শোনা যায়।

কিন্তু কালীপ্রসন্নের একটি দোষ ছিল—তা ভাষার অসংযম। তিনি শব্দ-প্রয়োগে যেমন যত্নশীল, তেমনি শৌখিন ও অসংযমী ছিলেন। ফেনায়িত আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় তাঁর চিন্তাধারা অবারিত বেগে প্রবাহিত হয়েছে। সেদিনের

গদ্যলেখকদের এইটী ছিল দোষ। মাত্রাধিক উচ্ছ্বাসের তাপে ব্যক্তব্যকে তরঙ্গায়িত ও ফেনায়িত রূপে প্রকাশ করা সেদিনের প্রথা ছিল। ফলে কালীপ্রসন্নের রচনার ফলশ্রুতি নিবিড় ও সংহত নয়; তা অগভীর জলজপুষ্প-সমাকীর্ণ; দ্রুতগতি স্রোতে তা পাঠক মনের উপর দিয়ে ভেসে যায়, স্থিতিলাভ করে না। এই দোষের মূলে আছে কালীপ্রসন্নের চরিত্র। তিনি বাগ্মী বলে' খ্যাত ছিলেন। কিন্তু এই বাগ্মিতাই তাঁর পক্ষে সংহত সংযত গদ্য রচনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গদ্যলেখক কালীপ্রসন্ন বাগ্মী কালীপ্রসন্নের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। বাগ্মীর পক্ষে স্বাভাবিক যে উচ্ছ্বাস, দ্রুতগতি ও অলংকৃত সুবিন্যস্ত বাক্যবিন্যাস ও শব্দাড়ম্বর পরিবেশন—তা কালীপ্রসন্নের গদ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর গদ্যে শব্দ ও অর্থালংকারের ঔজ্জ্বল্য আছে, আবার বাগ্মীর অসংযম ও তারল্য তাঁর গদ্যকে অগভীর ও অসংযমী করেছে। বাগাড়ম্বর ও অতিকথনের বেড়া ডিঙিয়ে আমরা যদি কালীপ্রসন্নের গদ্যরাজ্যে পৌঁছে'তে পারি, তাহলে একটি সযত্ন রোপিত ভাষা-উদ্যানের সন্ধান পাব, যা সুষ্ঠু বাক্যের মালায় গ্রথিত ও শব্দোচ্ছ্বাসের কলপ্রবাহে নিয়ত মুখরিত। কালীপ্রসন্নের গদ্যের ধ্বনিরোল (rolling sonority) পাঠককে মুগ্ধ করবেই।

কালীপ্রসন্নের এই লিরিকধর্মী অলংকৃত নৃত্যপরা গদ্যরূপের যৎসামান্য পরিচয়ই এই আলোচনা সমর্থন করবে।

'প্রভাতচিন্তা' গদ্যনির্মাতা কালীপ্রসন্নের প্রথম ফসল। এই গ্রন্থের 'নীরব কবি' প্রবন্ধের উদাহরণ ঃ

"কবিতার ভাষাও এই [প্রাকৃতিক] নিয়মের অধীন। লঘু কবির যত কিছু সম্পদ, তাহা শব্দেই পর্যবসিত হয়। তদপেক্ষা গাঢ়তর কবির শব্দ অল্প, রস-গাম্ভীর্য অধিক। কিন্তু যখন কাহারও হৃদয়ে কাব্যের সেই অমৃত স্রোত অতি প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়; যখন মন কল্পনার ঐন্দ্রজালিক পক্ষে উড্ডীন হইয়া তারকায় তারকায় প্রকৃতির জ্বলদক্ষর রেখা পাঠ করে, এবং গিরিশৃঙ্গ, সাগরগর্ভ, আলোক ও অন্ধকার সর্ব্বত্র একসঙ্গে বিচরণ করে; যখন জ্ঞান অনুভূতিতে ডুবিয়া যায়, এবং বুদ্ধি অনুসন্ধানে বিরত হইয়া তরঙ্গের সহিত তরঙ্গের ন্যায়

হৃদয়ে বিলীন হয়, তখন ভয়বিহ্বলা ভাষা আপনিই জড়ীভূত হইয়া যায়, কে আর তাহার কথা প্রকাশ করে? প্রকৃতি নীরব, কাব্য নীরব, কবিও তখন স্পন্দহীন ও নীরব। ভাবলহরী নীরবে উত্থিত হয়, নীরবে লীলা করে, এবং নীরবেই বিলয় পায়। মুগ্ধা বালা যেমন দর্পণে আপনার সুন্দর ছবি আপনি দেখিয়া চকিত নয়নে চাহিয়া থাকে, জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী যেমন আপনার সুখে আপনি হাসে, বনান্ত-বায়ু যেমন আপনার দুঃখে আপনি ক্রন্দন করে, কবিও তখন সেইরূপ আপনি পরিপূর্ণ হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় আপনাতে আপনি নিমজ্জিত হন। কাহার নিকট কি কহিবেন, কে কি শুনিয়া কহিবে, কে প্রশংসা করিবে, কে নিন্দা করিবে, কে তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইবে, কে অস্পষ্ট থাকিবে ইত্যাদি কোন চিন্তাই তাঁহার তদানীন্তন মনোময় জগতে স্থান প্রাপ্ত হয় না। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, জীবন ও মৃত্যু সমস্তই তখন তাঁহার বোধগম্য থাকে না। তাঁহার নিজের অস্তিত্বও ক্ষণকালের জন্য বিলুপ্ত হয়।”

উপরোক্ত উদাহরণে periodic বাক্যের নির্দিষ্ট সময়ান্তরে প্রবাহের উৎক্ষেপ ও পুনর্গতি শ্রবণকে আকৃষ্ট করে।

‘প্রভাত-চিন্তা’র অন্তর্গত ‘হরগৌরী, প্রবন্ধের একটি অংশ ঃ

“এই দুর্লভ মানবজীবন অনেকের পক্ষেই এক দুর্ব্বহ ভার। শোক নাই, দুঃখ নাই, ভোগ্যবস্তুর অভাব নাই, অন্যরূপ অভাবের তাড়না নাই;—তদুপরি হৃদয় স্ফূর্তিহীন, চক্ষু নিস্তেজ, মুখচ্ছবি বিষাদে মলিন। দিন যায়, রাত্রি আসে, রাত্রি যায় দিন আসে, আবার রাত্রি, আবার দিন,—আলোর পর অন্ধকার, অন্ধকারের পর আলো, সূর্য্য উঠিতেছে ও অস্ত যাইতেছে;—এক, দুই, তিন করিয়া ঘটিকাযন্ত্রের অশ্রান্তগতি লৌহ হস্ত ঘুরিয়া আসিতেছে ও ঘুরিয়া যাইতেছে; কিন্তু সময় কিছুতেই ফুরাইতেছে না, জীবনের অসহ্য ভার কিছুতেই কমিতেছে না, আত্মা কিছুতেই উৎসাহিত হইতেছে না।”

কালীপ্রসন্নের গদ্যে ধ্বনিরোল এখানে স্পষ্ট শোনা যায়। বিষয়ের তটভূমিকে গ্রাস করে' আবেগের প্রবল স্রোত এখানে আছড়ে পড়েছে। তরঙ্গোচ্ছ্বাসই কালীপ্রসন্নের গদ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আরেকটি উদাহরণ দিয়ে এ প্রসঙ্গের ছেদ টানি। 'প্রভাতচিন্তা'র শেষ প্রবন্ধ 'সাধনা ও সিদ্ধি'তে যে খেদপূর্ণ গদ্যোচ্ছ্বাস রয়েছে তা কালীপ্রসন্নের শব্দাড়ম্বর ও অলংকার-প্রিয়তার পরিচায়ক। সেখানে তিনি বলছেন:

"হায়! যে-দেশে স্তাবকতাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, সে-দেশে কাহার আর কিসে সিদ্ধি হইবে? যে দেশে প্রত্যেকেই শতমন্ত্রে দীক্ষিত এবং মন্ত্ররক্ষায় সকলেই অশিক্ষিত, যাহাদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ ও আস্ফালনের নাম উৎসাহ, চীৎকারের নাম উদ্যম, অঞ্চলবায়ুসেবনের নাম আত্মোৎসর্গ এবং অবিচলিত নিদ্রার নাম অধ্যবসায়, তাহাদিগের আর ভরসা কোথায়? যাহারা প্রাতঃসূর্য্যের অভ্যুদয়ে যে কার্য্যের কল্পনা করে, সন্ধ্যা না হইতেই তাহার ফলভোগের জন্য ব্যস্ত হয়,—এক রাত্রিতেই রোম নির্ম্মাণ করিতে চাহে, শ্মশ্রুদ্গমের পূর্ব্বেই—জীবনের সকল ব্যাপার সম্পাদন করিয়া কীর্ত্তিশৈলে আরূঢ় হইয়া বসে, তাহাদিগের আর আশা কি? তবে জানি না, কবে সাধকের পুনরুদয় হইবে,—কবে আবার সাধনা পুনঃ প্রবর্তিত হইয়া অন্ধকারকে আলোক দান করিবে।"

এখানে বাক্যগঠনে সযত্ন প্রয়াস লক্ষণীয়। জিজ্ঞাসা-চিহ্ন-সূচক বাক্যগুলির মধ্য দিয়ে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ প্রকাশিত হয়েছে। এখানে ভাবোচ্ছ্বাসবাহী দ্রুতগতি গদ্যেরই প্রাধান্য।

কালীপ্রসন্নের এই গুণ, এই তাঁর দুর্বলতা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতী-পত্রিকার সম্পাদক, দার্শনিক, কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) বাংলা গদ্যের অন্যতম শিল্পী ছিলেন, এ কথা আমরা সব সময় মনে রাখি না। কবি দ্বিজেন্দ্রনাথই বিস্মৃতির পারে চলে গিয়েছেন, আর গদ্যশিল্পী দ্বিজেন্দ্রনাথ আমাদের লক্ষ্যেব বাইরে পড়ে আছেন। অথচ গদ্যশিল্পী হিশেবে দ্বিজেন্দ্রনাথেব বিশিষ্ট স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে। তাঁর একটি নিজস্ব গদ্যরীতি আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ—কারুর প্রভাবই তাঁব উপর পড়ে নি। এ বিষয়ে তিনিই একমাত্র ব্যতিক্রম। উনিশ ও বিশ শতকের বাকি গদ্যলেখকরা হয় বঙ্কিমচন্দ্র না হয় রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অল্পবিস্তব প্রভাবিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথকে আমবা স্বপ্নপ্রয়াণের (১৮৭৫) কবি বলেই জানি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সুবক্তা ও ভারতী-পত্রিকাব সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথেব গদ্যবচনা কম নয়। তাঁর মুখ্য গদ্যরচনা হচ্ছেঃ তত্ত্ববিদ্যা—৪ খণ্ড (১৮৬৬-৬৯), গীতাপাঠ (১৯১৫), নানা চিন্তা (১৯২০), প্রবন্ধমালা (১৯২০), চিন্তামণি (১৯২২)। দ্বিজেন্দ্রনাথ অসাধারণ বিচিত্র প্রতিভার অধিকাবী ছিলেন। কাব্যে, গণিতে, ভাষাতত্ত্বে, দর্শনে, কাগজেব বাক্স ও বাংলা শর্টহ্যাণ্ড-অক্ষব বচনায় তাঁর সমান কৌতূহল ছিল। আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদাসীন, নির্লিপ্ত, অনাসক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করলে বাংলা গদ্যের মহৎ শিল্পী রূপে স্বীকৃতি লাভ করতে পারতেন। কিন্তু স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভের কোনো প্রযাসই তাঁব চবিত্রে ছিল না। তাই তিনি বাঙালী পাঠকসমাজের কাছে যোগ্য সমাদব পান নি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ মূলত দার্শনিক। তাঁর শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনা হচ্ছে—গীতাপাঠ। দুরূহ মৌলিক দর্শন ও তত্ত্বকথাকে সরল ও প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যা করার বিরল ক্ষমতা দ্বিজেন্দ্রনাথের ছিল। এখানেই আমরা তাঁর গদ্যরীতির সূত্রটি পাই।

গদ্যে তিনি যে ভাষারীতি ব্যাহার করেছেন, তার প্রধান গুণ—যুক্তি, শৃঙ্খলা ও প্রাঞ্জলতা। এই গুণ তাঁর কাব্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। এই গদ্যের প্যাটার্ন নিতান্তই দেশী। কিছু চলতি বাংলা ইডিয়ম, কিছু বা সংস্কৃত টার্ম। এ গদ্যরীতি অলংকারবিরল, কথ্যভাষানুসারী নয় অথচ কথ্যরীতি, তা

দ্বিজেন্দ্রনাথের নিজস্ব স্টাইল বা ভাষারীতি। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন,

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মনে যদি এমন কোনও ভাব উদিত হয়, যাহা প্রকাশের উপযুক্ত খাঁটি দেশী ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তাহাকে প্রকাশের জন্য বিদেশী ইডিয়মে অনুবাদ করিতে যাইব কেন? আমি কখনো ওপথ মাড়াই নাই। আমার লেখার এই বিশিষ্টতা আর কেহ বুঝিতে পারিবে কিনা জানি না কিন্তু কৃষ্ণকমল পারিবে।"

আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষারীতির ভূয়সী প্রশংসা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রনাথকে উপেক্ষার অভিশাপ পেতে হল।

দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা পড়তে পড়তে একথাই মনে হয়, এই ভাষারীতি বা স্টাইলের যদি চর্চা হত, তাহলে সাধু ও কথ্যভাষার কলহ বহুদিন আগেই মিটে যেত। প্রমথ চৌধুরীর ভাষারীতি কথ্যভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত, একথা অনস্বীকার্য, কিন্তু তা অতি-শিষ্ট বিদগ্ধমণ্ডলীর ভাষা। তা প্রাকৃত নয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষারীতি প্রাকৃত বাংলার উপর প্রতিষ্ঠিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষারীতি দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষারীতির কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। এ দুয়ে দেশী-বিদেশী-সংস্কৃতর অপূর্ব পরিণয় সংঘটিত হয়েছে। বিশ্রম্ভালাপের সুর এই স্টাইলের ভিত্তি। এখানে গ্রাম্যতা অনুপস্থিত, আবার কৃত্রিম শহুরে আনাও অবাঞ্ছিত। তাই একে বলেছি প্রাকৃত বাংলা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রাকৃত গদ্যরীতিকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু হায়, তাঁর অনুবর্তী হয়ে কেউ এলেন না!

এখন দ্বিজেন্দ্রনাথের শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রাঞ্জল যুক্তিপ্রধান সাবলীল গদ্যের কিছু কিছু পরিচয় তুলে দিচ্ছি, এ থেকেই তাঁর ভাষারীতির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হবে।

'গীতাপাঠ' গ্রন্থের প্রথম কয়টি বাক্য:

"এ শান্তিনিকেতন। আমার কুটীরে বিনা-তৈলে একটি দীপ জ্বলিতেছে

—ভগবদ্‌গীতা। আমাদের দেশের মস্তকের উপর দিয়া এত যে বাত্যার উপর বাত্যা চলিয়া যাইতেছে—কিন্তু আশ্চর্য্য ঈশ্বরের মহিমা—উহার অটল জ্যোতি সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত সমান রহিয়াছে—ক্ষণকালের জন্যও ক্ষুব্ধ বা ম্লান হয় নাই। পশ্চিমের সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া যত না আলোক-চ্ছটা দিগ্‌দিগন্তরে বিস্তার করিতেছে আমাদের ঐ ক্ষুদ্র দীপের অপরাজিত শিখা সে সমস্তেরই উপরে মস্তক উত্তোলন করিয়া স্বর্গীয় মহিমায় দীপ্তি পাইতেছে।"

এই গ্রন্থেরই 'তৃতীয় অধিবেশনের' শেষাংশ ঃ

"আনন্দ সম্বন্ধে এ যাহা আমি কথা-প্রসঙ্গে বলিলাম এটা সাধন-পদ্মানদীর ওপারের কথা; আমরা কিন্তু রহিয়াছি এপারে কারারুদ্ধ; কাজেই, আমাদের পক্ষে ওরূপ উচ্চ আনন্দের কথাবার্ত্তার আন্দোলন একপ্রকার 'গাছে কাঁঠাল—গোঁফে তেল'। এ-রকমের বাক্যবাণ আমার সহা আছে ঢের; সুতরাং উহা গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া আমার যাহা কর্ত্তব্য মনে হইল তাহাই আমি করিলাম—যাত্রীরা পাছে নৌকাযোগে পদ্মানদী পার হইতে অনিচ্ছুক হন—এই জন্য পদ্মানদীর ওপার যে কিরূপ রমণীয় স্থান তাহা দুরবীণ-যোগে তাঁহাদিগকে দেখাইলাম। এখন নৌকা আরোহণ করিবার সময় উপস্থিত; অতএব, যাত্রী-ভায়ারা পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া প্রস্তুত হউন।"

এই পরিহাসপ্রিয়তা দ্বিজেন্দ্রনাথের চরিত্র থেকে লেখায় সঞ্চারিত হয়েছে, অথচ বিষয়ের গুরুত্ব কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নি, গদ্যরীতি সরস ও স্বচ্ছন্দ, প্রাঞ্জল ও সাবলীল হয়য়ছে। তার আরেকটি উদাহরণ নেওয়া যাক। এটি 'নানা চিন্তা'র অন্তর্গত 'দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব' প্রবন্ধ থেকে ঃ

"আমার শাস্ত্রে লেখে এই যে, হিতবাক্য লোকের মনোহারী হইবে কি হইবে না তাহা ভাবিবার কোনো প্রয়োজন করে না—চোখ কান বুজিয়া তাহা বলিয়া

ফ্যালাই ভাল ; যে শোনে সে শুনিবে, যে না শোনে না শুনিবে ; তুমি তো বলিয়া খালাস! তুমি যদি জানিতে পারিয়া থাক গঙ্গার ঘাটে কুমিরের আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে, তবে সে কথা শহরময় রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া তোমার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে এটা সত্য যে, জ্ঞানের হিতবাক্য কাহারো প্রাণে সহে না, তাহা এক কান দিয়া শ্রোতার মস্তিষ্কসদনে প্রবেশ করে—শুদ্ধ কেবল ভদ্রতার অনুগ্রহে ভরসা করিয়া ; কিন্তু প্রবেশ করিয়া যখন দেখে যে, হৃদয়দ্বারে কপাট বন্ধ, তখন বসিতে না পাইয়া আর এক কান দিয়া সুড়সুড় করিয়া বাহির হইয়া যায়। মনস্তুষ্টিকর অহিত বাক্যের কুহকে ভুলিয়া রসাতলের অভিমুখে ধাবমান হইতেছে এরূপ কৃপাপাত্র আমি কত যে দেখিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই, পরন্তু তাহাদের মধ্যকার একজনকেও আজ পর্যন্ত দেখিলাম না যে, সে কাহারো হিতবাক্য শুনিয়া সৎশিক্ষা লাভ করিয়াছে। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী! যে শেখে, সে ঠেকিয়া শেখে। বলিতেছি বটে 'ঠেকিয়া শেখে', কিন্তু কাহাকে বলে তাহা যদি শোনো, তবে তোমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিবে :—ঠেকিয়া শেখা'র আর এক নাম মৃত্যুমুখে প্রবেশ করা। দশজন স্নানযাত্রী গামছা কাঁধে করিয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়াছে দেখিয়া তুমি তাহাদিগকে উচ্চৈস্বরে বলিতেছ "জলে নাবিও না —গঙ্গায় কুমির দেখা দিয়াছে।" পাঁচজন তোমার সে-কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া এক-কোমর জলে, আর পাঁচজন তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক-হাঁটু জলে নাবিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কোমর-জলের মহারথীরা চকিতের মধ্যেই জল-গর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল—ইহারই নাম ঠেকিয়া শেখা। হাঁটু-জলের অর্ধরথীরা দ্রুতগতি ডাঙায় উঠিল—ইহারই নাম দেখিয়া শেখা।"

এর মধ্যে আগাগোড়া বিশ্রম্ভালাপের সুর শোনা যায়। এর জোরেই এই ভাষারীতি অনায়াসগতি ও সাবলীল হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ সর্বত্র এই ভাষারীতি বজায় রেখেছেন। গীতাপাঠের ভূমিকায়, সামাজিক সমস্যার নিরসনে, দুরূহ তত্ত্বালোচনায়, ব্যাকরণ আলোচনায়, জ্যামিতি আলোচনায়—সর্বত্রই এই প্রাকৃত গদ্যরীতি অনুসৃত হয়েছে। আরেকটি উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হব। আগের ও বর্তমান উদাহরণে দেশী-বিদেশী ইডিয়মের

নিঃসঙ্কোচ বহুল প্রয়োগ লক্ষণীয়। 'প্রবন্ধমালা'র অন্তর্গত 'সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা' প্রবন্ধের একটি অংশ ঃ

"আমাদের দেশে প্রথম প্রথম অর্থোপার্জ্জনই ইংরাজি শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং প্রবর্তক ছিল। ইংরাজি শিক্ষাতে অর্থোপার্জ্জন ছাড়া আর যে কোনো ফল দর্শিতে পারে, অর্ধশতাব্দীপূর্ব্বে আমাদের দেশে দুই একজন অসাধারণ মহাত্মা ব্যতিরেকে আর কেহই তাহা বিশ্বাস করিতেন না। ক্রমে ইংরাজি-শিক্ষার সুফলের প্রতি লোকের চক্ষু ফুটিতে আরম্ভ করিল। হিন্দু কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। হিন্দু কালেজে ডিরোজিও নামক একজন উঁচু-দরের বায়ু-প্রধান শিক্ষক ছিলেন—তাঁহারই মুখের ফুঁয়ে পিত্তানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। এই ক্ষুদ্র বীজ হইতে ইয়ঙ্ বেঙ্গালের অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিল। এই অঙ্কুর যখন কাল-ক্রমে সতেজ হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহা ইংরাজি ভাষায় "ইয়ঙ্ বেঙ্গালের দল" এবং বাঙ্গালি ভাষায় "ছোঁড়ার দল" উপাধি প্রাপ্ত হইল। অন্যকে উপাধি প্রদান করিতে গেলে আপনাকেও উপাধির ভার স্কন্ধে বহিতে হয়—এই গতিকে উপাধিপ্রদাতারাও একটি পাল্টা উপাধি প্রাপ্ত হইলেন—কি? না, গোঁড়ার দল। বঙ্গসমাজে, এইরূপে, দুই পক্ষের সৃষ্টি হইল—গোঁড়ার দল এবং ছোঁড়ার দল; গোঁড়ার দল এ-পক্ষ, এবং ছোঁড়ার দল ও-পক্ষ।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাই বিশ্রম্ভালাপের কথক। এক্ষেত্রে তিনি দ্বিতীয়রহিত। বাংলা গদ্যকে গ্রাম্য পর্যায়ে না নামিয়ে এবং কৃত্রিম শিষ্ট পর্যায়ে না তুলে, কী ভাবে অনায়াসগতি সাবলীল প্রাঞ্জল রূপে ব্যবহার করা যায়, তার প্রকৃষ্ট পরিচয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্যরচনা। এ ভাষারীতিতে যে সম্ভাবনা রয়েছে, আজ পর্যন্ত তা উপযুক্ত অনুগামীর দ্বারা পরীক্ষিত হল না, এটাই আক্ষেপ।

রবীন্দ্রনাথ

কবিতায় রবীন্দ্রনাথ গোড়া থেকেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন, কিন্তু গদ্যরাজ্যে তা ঘটেনি। 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকেরা জানেন কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'র একজন লুব্ধ পাঠক ছিলেন। উপন্যাস ও প্রবন্ধ এ দুই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রথম পর্বে বঙ্কিমের উপন্যাস ও প্রবন্ধের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'রাজর্ষি' ও 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রভাব যেমন প্রকট, তেমনই 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৮৮৩) ও 'আলোচনা' (১৮৮৫)—কিশোর রবীন্দ্রনাথের এ দু'টি প্রবন্ধ পুস্তকে বঙ্কিমের 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর প্রভাব তেমনই প্রকট। এই প্রভাব কেবল বিষয়বস্তুতে নয়, প্রকাশভঙ্গীতে—ভাষায়, আঙ্গিকে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে উপন্যাস ও প্রবন্ধে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা মূলতঃ বঙ্কিমী ভাষা। পদ্যে রবীন্দ্রনাথ যে পরিবর্তন সাধন করেছিলেন, তা'তে আমাদের চমকে উঠতে হয়। 'মানসী' (১৮৯০) কাব্য আমাদের উনিশ-শতকী কাব্য-ঐতিহ্যের অনুগত অনুসারী নয়, তাকে সে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু গদ্যের ক্ষেত্রে এ কথা বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের গদ্যে দ্রুতগামিতা ছিল না। ছিল রক্ষণশীলতা—বঙ্কিম-প্রবর্তিত পথেই তিনি অনেকদিন চলেছেন। কিন্তু এটাই রবীন্দ্র-গদ্যের প্রথম পর্ব সম্পর্কে শেষ কথা নয়। বঙ্কিম-অনুসারী রক্ষণশীল সাধু গদ্য তিনি অর্ধ-জীবন ভোর ব্যবহার করেছেন গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধে। প্রাক্-'সবুজপত্র' পর্ব পর্যন্ত এই সাধু ভাষার অন্তরালে আরেকটি ধারা রবীন্দ্রনাথ রক্ষা করেছিলেন—তা মুখের ভাষা—সাহিত্যে যা ছিল অপাংক্তেয়। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন আঠারো বছর বয়সে ; আর 'ছিন্নপত্র' (১৮৯৪) রচনা করেন চব্বিশ থেকে চৌত্রিশ বছর বয়সে ; এগুলি জনসমক্ষে প্রচারের কথা লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ একবারও ভাবেন নি, তাই এই পত্রগুচ্ছে তিনি 'স্বাধীনভাবে' মনের কথা মুখের ভাষায় লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই দ্বিধা ও সঙ্কোচ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন 'সবুজপত্রে' (১৯১৪)। চলিত ভাষাকে

তিনি সকল কাজের জন্য বরণ করে নিলেন ; দীর্ঘ তিরিশ বছরের (১৮৮৩-১৯১৪) টানা-পোড়েন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল।

কিশোর রবীন্দ্রনাথের গদ্যের রূপ ছিল কি রকম ? 'ভারতী' পত্রিকায় বাং ১২৮৮-৮৯ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৮৮৩) থেকে কয়েকটি ছত্র তুলে দিচ্ছি—এ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক গদ্যের রূপ ও স্টাইল—এ দুইই লক্ষ্য করা যাবে।

"মনের বাগান বাড়ী

ভালবাসা অর্থে আত্মসমর্পণ নহে, ভালবাসা অর্থে, নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা, হৃদয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা নহে, হৃদয়ের যেখানে দেবত্র-ভূমি, যেখানে মন্দির, সেইখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা।

যাহাকে তুমি ভালবাস, তাহাকে ফুল দাও, কাঁটা দিও না ; তোমার হৃদয় সরোবরের পদ্ম দাও, পঙ্ক দিও না। হাসির হবা দাও, অশ্রুর মুক্তা দাও, হাসির বিদ্যুৎ দিও না, অশ্রুর বাদল দিও না।"

তারপর 'ভারতী' পত্রিকায় বাং ১২৯১-৯২ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন 'আলোচনা' (১৮৮৫) পুস্তক থেকে 'ডুব দেওয়া' শীর্ষক প্রবন্ধের 'এক কাঠা জমি'-র কয়েকটি ছত্র লক্ষ্য করা যাক।

"এক কাঠা জমি

একদল লোক আছেন তাঁহারা যেখানে যতই পুরাতন হইতে থাকেন সেখানে ততই অনুরাগ সূত্রে বদ্ধ হইতে থাকেন। আর একদল লোক আছেন, তাঁহাদিগকে অভ্যাস সূত্রে কিছুতেই বাঁধিতে পারে না, দশ বৎসর যেখানে আছেন সেও তাঁহার পক্ষে যেমন, আর একদিন যেখানে আছেন সেও তাঁহার পক্ষে তেমনি। লোকে হয়ত বলিবে তিনিই যথার্থ দূরদর্শী, অপক্ষপাতী, কেবলমাত্র সামান্য অভ্যাসের দরুণ তাঁহার নিকট কোন জিনিষের একটা মিথ্যা বিশেষত্ব প্রতীতি হয় না। বিশ্বজনীনতা তাঁহাতেই সম্ভবে। ঠিক উল্টো কথা। বিশ্বজনীনতা তাঁহাতেই সম্ভবে না।"

আর একটি প্রবন্ধ-সংকলন 'সমালোচনা'-র (১৮৮৮ ; ভারতী পত্রিকায়

১২৮৮।৮৯ সালে প্রকাশিত) একটি পুস্তক-সমালোচনা গ্রহণ করি। 'ডিপ্রোফণ্ডিস্' (ভারতী ঃ আশ্বিন, ১২৮৮) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ "টেনিসন এই কবিতাটিকে The Two Greetings কহিয়াছেন। অর্থাৎ ইহাতে তাঁহার সন্তানটিকে দুইভাবে তিনি সম্ভাষণ করিয়াছেন। প্রথমত তাঁহার নিজের সন্তান বলিয়া, দ্বিতীয়ত তাঁহার আপনাকে তফাত করিয়া। এক তাঁহার মর্ত্যজীবন ধরিয়া আর এক তাঁহার চিরন্তন সত্তা ধরিয়া। একটিতে তাহাকে আংশিকভাবে দেখিয়া আর-একটিতে তাহাকে সর্বতোভাবে দেখিয়া। তাঁহার সন্তানের মধ্যে তিনি দুইভাগ দেখিতে পাইয়াছেন; একটি ভাগকে তিনি স্নেহ করেন, আর একটি ভাগকে তিনি ভক্তি করেন। প্রথম সম্ভাষণ স্নেহের সম্ভাষণ দ্বিতীয় সম্ভাষণ ভক্তির।"

এটি পড়লেই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সাধু-গদ্য রচনার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করেছেন—ছোট ছোট কাটা কাটা বাক্য ও ক্রিয়াপদের বিরলতা এই লেখাটিকে গতি দিয়েছে।

'আলোচনা' ও 'সমালোচনা' গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধে ছোট ছোট বাক্যের সাবলীল গতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আবার কয়েকটি প্রবন্ধে গুরুগম্ভীর দীর্ঘ বাক্য আছে। 'লিপিকার' যে স্টাইল তার খানিকটা আভাস পাই 'আলোচনা' গ্রন্থের (১৮৮৫) 'সৌন্দর্য ও প্রেম' প্রবন্ধে। সুন্দরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন ঃ "যথার্থ যে সুন্দর সে প্রেমের আদর্শ, তাহার কোনখানে বিরোধ-বিদ্বেষ নাই। ইন্দ্রধনুর রংগুলি প্রেমের রং, তাহাদের মধ্যে কেমন মিল! এই মিলই সুন্দরের নির্যাস। যাহাতে মিল নাই, তাহা সুন্দর নহে। যাহা সুন্দর তাহার হাতের সাধারণের সহিত আশ্চর্য মিল আছে। আমাদের মনই সৌন্দর্যপিপাসু। এইজন্য সুন্দরকে আমরা অবজ্ঞা করিতে পারি না। এখন যাহাদের মধ্যে এই সৌন্দর্যবোধ নাই, তাহাদের জন্য কে চেষ্টা করিবে? কবি।—তাঁহার কাজই হইতেছে আমাদের মনে সৌন্দর্য উদ্রেক করিয়া দেওয়া।"

ধর্ম-সম্পর্কিত রচনায় দেখা যায়—পরবর্তী—'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধধারার ভূমিকা রচিত হয়েছে এই বঙ্কিমী স্টাইলের অনুসারী সাধু গদ্যে। শান্তিনিকেতনে

দশম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষ্যে পঠিত (৮ মাঘ, ১৩০৭ সাল) 'ব্রহ্মমন্ত্র' অভিভাষণের (১৯০০) কয়েকটি ছত্র এখানে তুলে দিচ্ছি।

"যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত সংসারকে আচ্ছন্ন দেখে সংসার তাহার নিকট একমাত্র মুখ্যবস্তু নহে—সে যাহা ভোগ করে তাহা ঈশ্বরেব দান বলিয়া ভোগ করে—সে ধর্মের সীমা লঙ্ঘন করে না—নিজের ভোগমত্ততায় পরকে পীড়া দেয় না। সংসারকে যদি ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত না দেখি, সংসারকেই যদি একমাত্র মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া জানি তবে সংসারসুখেব জন্য—আমাদের লোভের অন্ত থাকে না, তবে প্রত্যেক তুচ্ছ বস্তুর জন্য হানাহানি কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, দুঃখ হলাহল মথিত হইয়া উঠে। এইজন্য সংসারীকে একান্ত নিষ্ঠার সহিত সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে—কারণ সংসারকে ব্রহ্মেব দ্বারা বেষ্টিত জানিলে এবং সংসারেব সমস্ত ভোগ ব্রহ্মের দান বলিয়া জানিলে তবেই কল্যাণের সহিত সংসার যাত্রা নির্বাহ সম্ভব হয়।"

এই ভাষণে দেখি দীর্ঘ পল্লবিত একাধিক বাক্যাংশযুক্ত সাধু বাক্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ শক্তি নিয়োগ করেছেন। বঙ্গদর্শন-গোষ্ঠীর লেখকদের ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের গদ্যে এই লক্ষণটি ধরা পড়ে।

গল্পগুচ্ছের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সকল গল্পই সাধু ভাষায় লেখা। কিন্তু এই সাধু ভাষার রূপও পরিবর্তিত হয়েছিল। প্রথম গল্প 'ঘাটের কথা'র রচনাকাল কার্তিক, ১২৯১ সালে (১৮৮৪)। দ্বিতীয় গল্প 'রাজপথের কথা' অগ্রহায়ণ, ১২৯১ সালে লেখা। এ দুয়ের ভাষা বঙ্কিমী সাধু ভাষা—গুরুগম্ভীর, মন্থরগতি, সংলাপ অংশও সাধু ভাষায়। 'ঘাটের কথা'র প্রথম কয়টি ছত্র দেখা যাক: "পাষাণে ঘটনা যদি অঙ্কিত হইত তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিত। পুরাতন কথা যদি শুনিতে চাও তবে আমার এই ধাপে বইস ; মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থাকো, বহুদিনকার কত বিস্মৃত কথা শুনিতে পাইবে।"

এর পর রচিত তৃতীয় গল্পটি—'দেনাপাওনা'র রচনাকাল ১২৯৮ সাল (১৮৯১ খৃঃ)। এ গল্পের ভাষাও সাধু-ভাষা, কিন্তু এ ভাষা কত সাবলীল, কত স্বচ্ছন্দগতি, কত ভারমুক্ত। গোড়ার কয় ছত্র দেখুন: "পাঁচ ছেলের

পর যখন এক কন্যা জন্মিল তখন বাপ-মায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নিরুপমা। এ গোষ্ঠীতে এমন শৌখিন নাম ইতিপূর্বে কখনও শোনা যায় নাই। প্রায় ঠাকুর দেবতার নামই প্রচলিত ছিল—গণেশ-কার্তিক, পার্বতী তাহার উদাহরণ।"

এরপর থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের প্রথমাংশ গল্পগুচ্ছের সকল গল্পই সাধুভাষায় লেখা। কিন্তু দিনে দিনে তা আরো সাবলীল ও স্বচ্ছন্দগতি হয়ে উঠেছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক্।

(১) "লাবণ্যলেখা পশ্চিম প্রদেশের নব-শীতাগমসম্ভূত স্বাস্থ্য—এবং সৌন্দর্যের অরুণ পাণ্ডুরে পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া নির্মল শরৎকালের নির্জন নদীকূল লালিত অম্লান প্রফুল্লা কাশবনশ্রীর মতো হাস্যে ও হিল্লোলে ঝলমল করিতেছিল।" (রাজটীকা; আশ্বিন, ১৩০৫)—বঙ্কিমী অনুপ্রাস ও সন্ধি-সমাসের আড়ম্বর এখানে আছে, কিন্তু এর সাবলীল গতি অক্ষুন্ন আছে।

(২) "আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব! আমি এই ঘূর্ণমান পরিবর্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব! তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে, হে দিব্যরূপিণী! তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জুরকুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তোমাকে কোন বেদুইন দস্যু, বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মতো মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপরে চড়াইয়া জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন্ বাদশাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া, তোমায় সোনার শিবিকায় বসাইয়া, প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল। সেখানে সে কী ইতিহাস। সেই সারঙ্গীর সঙ্গীত, নূপুরের নিক্কণ এবং সিরাজের সুবর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত। কী অসীম ঐশ্বর্য; কী অনন্ত কারাগার। দুইদিক দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে। শাহেন শা বাদশা শুভ্র চরণের তলে মণি মুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে; বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মতো

হাবশি দেবদূতের মতো সাজ করিয়া, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসংকুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্য-প্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে।" (ক্ষুধিত পাষাণ ঃ শ্রাবণ, ১৩০২)। এখানে শব্দ ও অলঙ্কারের মেলা বসে গেছে। এই সুপ্রচুর আড়ম্বরের মধ্যে থেকে সাধু গদ্যকে রবীন্দ্রনাথ কী অনায়াসগতিতে চালনা করেছেন, তাই এখানে লক্ষণীয়।

(৩) "ঘাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে এমন হঠাৎ বলয়-নিক্কণশব্দে একটি সুকোমল বাহুপাশ সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুটতুল্য ওষ্ঠাধর দস্যুর মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরাম অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বনে তাহাকে বিস্ময়প্রকাশের অবকাশ দিল না। অপূর্ব প্রথমে চমকিয়া উঠিল। তাহার পর বুঝিতে পারিল, অনেক দিনের একটি হাস্যবাধায়-অসম্পন্ন চেষ্টা আজ অশ্রুজলধারায় সমাপ্ত হইল।" ('সমাপ্তি' "আশ্বিন, ১৩০০)—এখানে সন্ধি ও সমাসের ঘটা আছে। দীর্ঘ বিশেষণের বহুল ব্যবহার ঘটেছে, তথাপি এই স্বচ্ছন্দ গতি ক্ষুণ্ণ হয় নি।

(৪) "হায়, ভুল বলিয়াছিলাম! তুমি আমার আছ, একথাও স্পর্ধার কথা। আমি তোমার আছি, কেবল এইটুকু বলিবার অধিকার আছে। ওগো, একদিন কণ্ঠ চাপিয়া আমার দেবতা এই কথাটি আমাকে বলাইয়া লইবে। কিছুই না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাকে থাকিতেই হইবে। কাহারও উপরে কোন জোর নাই; কেবল নিজের উপরেই আছে।" (দৃষ্টিদান ঃ পৌষ, ১৩০৫)—এখানে শব্দের ঐশ্বর্য বা সমাসের বাহুল্য নেই, সাধু গদ্যের ক্রিয়াপদকে রক্ষা করা হয়েছে, তা ঠিক্, কিন্তু এর চাল চল্‌তি ভাষার চাল।

গল্পগুচ্ছের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড থেকে গৃহীত এই চারটি উদাহরণের ভাষা সাধু ভাষা। এগুলির মধ্যে রবীন্দ্র-গদ্যের প্রথম পর্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা যায়। সন্ধি-সমাসের বাহুল্য আছে, কিন্তু তা গদ্যের গতিকে মন্থর করে নি। বিশেষণ ও উপমা অজস্র আছে। দীর্ঘ বিশেষণ ও দীর্ঘ উপমা—দুই-ই রবীন্দ্রনাথ অনায়াস নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই বিশেষণগুলি

অনিবার্য, উপমাগুলি একান্ত স্বাভাবিক। স্তরে স্তরে উপমা রবীন্দ্রনাথ চয়ন করেছেন। 'ক্ষুধিত পাষাণের' উদ্ধৃত অংশটিতে লক্ষ্য করা যায় বাক্যাংশের পর বাক্যাংশে কেমন অনায়াসে একটি সম্পূর্ণ চিত্র ফুটে উঠেছে।

গল্পগুচ্ছের তৃতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষা পুরোপুরি ব্যবহার করলেন সর্বপ্রথম 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে (শ্রাবণ, ১৩২১)। যখন 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষাকেই মেনে নিলেন, এ গল্প সেই সময়ে—১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা।

এই চলতি ভাষাকে গ্রহণ করার পিছনে কোন্ প্রেরণা কাজ করেছিল? তা কি বাইরের তাগিদ—প্রমথ চৌধুরীর উৎসাহ, না অন্তরের তাগিদ? এ প্রশ্নের মীমাংসা করা প্রয়োজন। এই প্রবন্ধের সূচনায় আমরা বলেছি, রবীন্দ্রনাথ গোড়া থেকে চলতি ভাষার চর্চা করেছেন। যখন 'আলোচনা', 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'রাজর্ষি', 'বৌঠাকুরাণীর হাট' প্রভৃতি বঙ্কিমী ভাষায় লিখছেন, তখন প্রকাশ্য সভায় নয়, বৈঠকখানায় ও চিঠিপত্রে—'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' ও 'ছিন্নপত্র'-এ চলতি ভাষাকেই মেনে নিয়েছেন। 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) তাঁর চলতি ভাষার লেখা প্রথম উপন্যাস, কিন্তু কোনমতেই প্রথম রচনা নয়। এর আগে তিনি লিখেছেন 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১), 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' (১৮৯১), 'ছিন্নপত্র' (১৮৯৪), 'শান্তিনিকেতন' বক্তৃতামালা, 'গোরা' উপন্যাসের (১৯১০) সংলাপের অংশ, হাস্যরচনা ও কৌতুক নাট্যগুলি, অচলায়তন (১৯১১) পর্যন্ত নাটক। 'সবুজ পত্র' এ ক্ষেত্রে মূল প্রেরণাস্থল নয়, তা নিমিত্ত মাত্র। এই চলতি ভাষার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা ইতঃপূর্বেই ঘটেছে। আঠারো বছর বয়সে লেখেন 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' আর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস লেখেন পঞ্চাশ পেরিয়ে। এই সুদীর্ঘকাল তিনি উপরোক্ত গ্রন্থগুলিতে পাত্র-পাত্রীর সংলাপে, আচার্যরূপে প্রদত্ত ভাষণে ও আত্মীয় বন্ধুবর্গের নিকট লিখিত পত্রগুচ্ছে এই চলতি ভাষাই ব্যবহার করেছেন। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে এই সাধনার পরিপূর্ণ ফল আমরা পেলাম। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের প্রথম সরকারী সাহিত্য রচনা (নাটক বা কৌতুক বাদ দিয়ে)। এই উপন্যাস থেকে

শুরু হল নতুন যাত্রা। পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত যে সাধুভাষাকে তিনি ব্যবহার করে এসেছেন, এখানে তা অবলীলাক্রমে ত্যাগ করলেন। অভ্যস্ত প্রথাকে বর্জন কবতে এতটুকু বাধলো না, আর কোনদিন—জীবনের শেষ পর্যন্ত বাকী তিরিশ বছর আর কখনো পিছন ফিরে তাকালেন না। চলতি ভাষাকে বরণ করে ঘরে তুললেন, তা কি শুধু 'সবুজ পত্রে' লেখার তাগাদায়? তা নয়; বাইরের তাগাদা হলে তা দুদিনে ফুরিয়ে যেত; জীবনের তিরিশ বছব নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলবাব প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ নিজের ভিতর থেকেই পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যের নির্মাতারূপে দেখা দিলেন। 'ঘবে-বাইবে' (১৯১৬) থেকে 'সভ্যতাব সংকট' (১৯৪১) অন্তিম ভাষণ এই পর্ব সযত্নে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে ববীন্দ্রনাথ কী ভাবে চলতি ভাষাকে সাহিত্যের চিবস্থায়ী মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত কবেছেন।

চলতি ভাযা কাকে বলে? সাধু ভাযা থেকে চলতি ভাষায় পার্থক্য কোথায়? তা কি শুধু ক্রিয়াপদ আর সর্বনামের রূপ পবিবর্তনেব উপর নির্ভর কবে? রবীন্দ্রনাথ চতুবঙ্গ (১৯১৬) উপন্যাসে এই প্রশ্নেব জবাব দিলেন, প্রমাণ করলেন ক্রিয়াপদ আব সর্বনামেব রূপ পরিবর্তনেব উপর সাধু ও চলতি ভাষাব প্রভেদ নির্ভব করে না। তিনি প্রমাণ কবলেন, দুয়েব স্বকীয় চাল, বাগভঙ্গী ও বৈশিষ্ট্য আছে। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে (১৯১৬) এই পবীক্ষাব আবেকদিক দেখা গেলো। রবীন্দ্রনাথেব এই ভাষা পবীক্ষা আলোচনাব আগে তাঁব প্রাক্-সবুজপত্র পর্বের চলতি ভাষাব দু একটা নমুনা নেওযা যাক।

আঠারো বছব বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'য়ুবোপ প্রবাসীব পত্র' (১২৮৬ সালের তৃতীয় বর্ষের 'ভারতী'তে "য়ুরোপযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকেব পত্র" নামে প্রকাশিত; গ্রন্থাকারে বাং ১২৮৮ সাল, ইং ১৮৮১ খৃঃ প্রকাশিত) লিখেছেন। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখেছেনঃ "বন্ধুদের দ্বাবা অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্রগুলি প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিতে আপত্তি ছিল; কাবণ কয়েকটি ছাড়া বাকী পত্রগুলি 'ভারতী'র উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নাই, সুতরাং সে সমুদয়ে যথেষ্ট সাবধানের সহিত মত প্রকাশ করা যায় নাই। ......আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয়স্বজনদের

সহিত মুখোমুখী এক প্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহারা চোখের আড়াল হইবা মাত্র আর এক ভাষায় কথা কহা কেমন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।” এ প্রসঙ্গে পরে ২৯শে আগষ্ট, ১৯৩৬-এ কবি বলেছেন: “য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়। এর পক্ষে একটা কথা আছে—সে হচ্ছে এর ভাষা। নিশ্চিত বলতে পারিনে কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম। আজ এর বয়স হ'ল প্রায় ষাট। সেক্ষেত্রে ত আমি ইতিহাসের দোহাই দিয়ে কৈফিয়ৎ দাখিল করবো না। আমার বিশ্বাস বাংলা চলতি ভাষার সহজ প্রকাশপটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।” এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালে সাহিত্যের প্রকাশ্য দরবারে একে হাজির করতে লেখকের আপত্তি ছিল এই জন্যে যে, চিঠির ভাষা ও মুখের ভাষা এক হওয়া প্রয়োজন, একথা স্বীকার করলেও প্রকাশ্য সাহিত্য দরবারে এই চলতি ভাষার ঠাঁই হতে পারে—তা তিনি ভাবেন নি। সে কথা ভেবেছিলেন পরে—'ছিন্ন-পত্রের' আমলে—দশ বছর পরে—সে চিঠিগুলিকে সাহিত্যের প্রকাশ্য দরবারে উপস্থিত করতে তিনি ইতস্ততঃ করেন নি। এখন 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রের' তৃতীয় পত্র থেকে একটু তুলে দিচ্ছি—চলতি ভাষার সহজ প্রকাশপটুতা দেখাবার জন্য। একটি বল্-নাচের বর্ণনা: “নাচ আরম্ভ হল। ঘুর-ঘুর-ঘুর। একটা ঘরে মনে করো চাল্লশ পঞ্চাশ জুড়ি নাচছে, ঘেঁষাঘেঁষি, ঠেলাঠেলি, কখনো বা জুড়িতে জুড়িতে ধাক্কাধাক্কি। তবু ঘুর-ঘুর-ঘুর। তালে তালে বাজনা বাজছে, তালে তালে পা পড়ছে, ঘর গরম হয়ে উঠছে। একটা নাচ শেষ হলো, বাজনা থেমে গেল; নর্তক মহাশয় তাঁর শ্রান্ত সহচরীকে আহারের ঘরে নিয়ে গেলেন, সেখানে টেবিলের উপর ফল-মূল-মিষ্টান্ন-মদিরার আয়োজন; হয়তো আহার পান করলেন, না হয় দু'জনে নিভৃতে কুঞ্জে বসে রহস্যালাপ করতে লাগলেন। আমি নতুন লোকের সঙ্গে বড়ো মিলে মিশে নিতে পারিনে, যে নাচে আমি একেবারে সুপণ্ডিত, সে নাচও নতুন লোকের সঙ্গে নাচতে পারিনে, সত্যি কথা বলতে কি, নাচের নেমন্তন্নগুলো আমার বড়ো ভালো লাগে না।” এই গ্রন্থের আরেকটি অংশ—এটি সেকালের ছড়ার রীতি অনুযায়ী সমিল গদ্যে (rhym prose) লেখা:

"তুমি এখানে আসতে ভাই, তা হোলে সমুদ্রের শব্দ শুনৃতে শুনৃতে, ঢেউ গুণ্‌তে গুণ্‌তে, ফুলের রাশে মাথা রেখে, ফুলের রেণু গায়ে মেখে, ফুলের মালা গেঁথে গেঁথে, ফুলের মধু খেতে খেতে, সন্ধে বেলায় সাগর বেলায়, দুজনেতে গলায় গলায়, ঘাসের পরে গাছের তলায়, গল্প হোত, হাসি হোত, ঠাণ্ডায় যদি কাশী হোত, বাড়ী যেতেম, চা খেতেম, হেসে খেলে দিন কাটাতেম।" বাংলার উপভাষাগুলির নানা ক্রিয়াপদিক রূপ এখানে নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়েছে।

'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী' পুস্তকে (১৩২১ বাং, ১৮৯১ ইং) য়ুরোপের উদ্দেশে যাত্রার সূচনায় ২২শে আগষ্ট, ১৮৯১ তারিখের দিনলিপিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : "তখন সূর্য অস্তপ্রায়। জাহাজের ছাদের উপর হালের কাছে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের তীরের দিকে চেয়ে রইলুম। সমুদ্রের জল সবুজ, তীরের রেখা নীলাভ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সন্ধ্যা রাত্রির দিকে এবং জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ক্রমশই অগ্রসর হচ্ছে। বামে বোম্বাই বন্দরের এক দীর্ঘরেখা এখনো দেখা যাচ্ছে ; দেখে মনে হলো আমাদের পিতৃপিতামহের পুরাতন জননী—সমুদ্রের বহুদূর পর্যন্ত ব্যাকুল বাহু বিক্ষেপ করে ডাকছেন, বলছেন, আসন্ন রাত্রিকালে অকূল সমুদ্রে অনিশ্চিতের উদ্দেশে যাসনে ; এখনো ফিরে আয়। ক্রমে বন্দর ছাড়িয়ে গেলুম। সন্ধ্যার মেঘাবৃত অন্ধকারটি সমুদ্রের অনন্ত শয্যায় দেহ বিস্তার করলে, আকাশে তারা নেই, কেবল দূরে লাইটহাউসের আলো জ্বলে উঠল। সমুদ্রের শিয়রের কাছে সেই কম্পিত দীপশিখা যেন ভাসমান সন্তানদের জন্য ভূমিমাতার আশঙ্কাকুল জাগ্রত দৃষ্টি।"

'ছিন্নপত্রে' জানুয়ারি, ১৮৯১ তারিখ-অঙ্কিত কালীগ্রাম থেকে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ঃ "এই যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালবাসি! ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা-সুদ্ধ দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছা করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি, এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম। স্বর্গ আর কী দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা-দুর্বলতাময় এমন সকরুণ আশঙ্কা-ভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত।

আমাদেব এই মাটির মা, আমাদেব এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনাব শস্যক্ষেত্রে স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসাব লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র সত্য হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্যরা তাদের রাখতে পারিনে, বাঁচাতে পারিনে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকেব কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবীব যতদূর সাধ্য সে করেছে।"

শিলাইদা থেকে ২১শে জুলাই, ১৮৯২ তারিখের এক পত্রে লিখছেন : "কাল বিকেলে শিলাইদহে পৌঁছেছিলুম, আজ সকালে আবার পাবনায় চলেছি, নদীর যে রোখ, যেন লেজ-দোলানো কেশর-ফোলানো তাজা বুনো ঘোড়ার মতো, গতি-গর্বে ঢেউ তুলে ফুলে ফুলে চলেছে—এই ক্ষেপা নদীর উপর চড়ে আমরা দুলতে দুলতে চলেছি, এর মধ্যে ভারি একটা উল্লাস আছে। এই ভরা নদীর যে কলরব সে কী আর বলব। ছল্‌ছল্‌ খল্‌খল্‌ করে কিছুতে যেন আর ক্ষান্ত হোতে পারছে না, ভারি একটা যৌবনের মত্ততার ভাব।"

প্রাক্-সবুজপত্র-পর্বের চলতি ভাষায় রচনার আর দুয়েকটি উদাহরণ পরীক্ষা করা যাক্। পূর্বগত উদাহরণগুলি চিঠি পত্র, তা প্রকাশ্য সাহিত্যসভার জন্য উদ্দিষ্ট নয়, একথা স্মর্তব্য। 'স্বদেশ' (১৯০৮) গ্রন্থের 'নূতন ও পুরাতন,' 'শিক্ষা' (১৯০৮) গ্রন্থের 'শিক্ষার মিলন,' 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৯০৭) গ্রন্থের 'নানা কথা,' এবং 'শান্তিনিকেতন' (১৯১০) ভাষণ-সঙ্কলনের 'শ্রাবণসন্ধ্যা'—অন্ততঃ এই চারটি প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রকাশ্য দরবারে রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষার আধারেই উপস্থিত করেছেন।

'নানাকথা' প্রবন্ধে (১২৯২ বাং/১৮৮৫ ইং) রবীন্দ্রনাথ বলছেন : "মানুষের হৃদয় ছড়িয়ে আছে, মিলিয়ে আছে, পৃথিবীর আলোয় ছায়ায়, তার গন্ধে, তার গানে। অতীতকালের সংখ্যাতীত মানুষের প্রেমে পৃথিবী যেন ওড়না উড়িয়ে আসে; বায়ুমণ্ডলে যেমন তার বাষ্পের উত্তরীয় এ তেমনি তার চিন্ময় আবরণ; এর মধ্য দিয়ে মানুষ রঙ পায় সুর পায় আপন চিরন্তন মনের। তাই যখন শুনি আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের সময়েও 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানু' দেখা যেত, তখন আপনাদের মধ্যে সেই পূর্বপুরুষদের চিত্ত অনুভব করি, তাঁদের

সেই মেঘদেখার সুখ আমাদের সুখের সঙ্গে যুক্ত হয় ; বুঝতে পারি, যাঁরা গেছেন তাঁরাও আছেন।”

‘শিক্ষার মিলন’ প্রবন্ধে (১৩০৮ বাং) বলছেন : “আমার প্রার্থনা এই যে ভারত আজ সমস্ত পূর্বভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর মহলে তার আসন পড়বে।”

‘শ্রাবণসন্ধ্যা’ প্রবন্ধে (শ্রাবণ, ১৩১৭ বাং) বলছেন : “আজ শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারাবর্ষণে জগতে আর যত-কিছু কথা আছে সমস্তকেই ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে ; মাঠের মধ্যে অন্ধকার আজ নিবিড়—এবং যে কখনো একটি কথা জানে না সেই মূক আজ কথায় ভরে উঠেছে। অন্ধকারকে ঠিকমতো তার উপযুক্ত ভাষায় কেউ যদি কথা কওয়াতে পারে তবে সে এই শ্রাবণের ধারাপতনধ্বনি। অন্ধকারের নিঃশব্দতার উপরে এই ঝর্‌ঝর্‌ কলশব্দ যেন পর্দার উপরে পর্দা টেনে দেয়, তাকে আরো গভীর করে ঘনিয়ে তোলে, বিশ্বজগতের নিদ্রাকে নিবিড় করে আনে। বৃষ্টিপতনের এই অবিরাম শব্দ, এ যেন শব্দের অন্ধকার।”

প্রাক্‌-সবুজপত্র-পর্বে রবীন্দ্রনাথ তাই চলতি ভাষার ব্যবহার মাঝে মাঝেই করেছেন, এর চর্চা কখনো সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন নি। কিন্তু এই পর্ব মূলত সাধুভাষার পর্ব। এই পর্বে তিনি সাধু গদ্য রচনায় চরম নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ‘শিক্ষা’, ‘স্বদেশ’, ‘সমূহ’, ‘রাজপূজা’, ‘সমাজ’, ‘পঞ্চভূত’, ‘প্রাচীন সাহিত্য’, ‘লোকসাহিত্য’, ‘আত্মশক্তি’, ‘স্বদেশী সমাজ’, ‘চারিত্র পূজা’, ‘বিচিত্র প্রবন্ধ’, ‘আধুনিক সাহিত্য’ : প্রথম মহাযুদ্ধের আগে প্রকাশিত এই সব প্রবন্ধ-পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ সাধু গদ্য রচনায় অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন। এই সকল সুপরিচিত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া বাহুল্য মাত্র। কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করছি যাতে এই নিপুণতার সম্যক্‌ পরিচয় পাওয়া যাবে : ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ (শিক্ষা), ভারতবর্ষের ইতিহাস ও নববর্ষ (স্বদেশ), মেঘদূত ও শকুন্তলা (প্রাচীন সাহিত্য), বঙ্কিমচন্দ্র (আধুনিক সাহিত্য), কেকাধ্বনি, নববর্ষা, পাগল ও শরৎ (বিচিত্র প্রবন্ধ)।

'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) ও 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬)—এই দু'টি উপন্যাসই সবুজ-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ঘরে-বাইরে উপন্যাসে রবীন্দ্রসাহিত্যে—সাধু ও চলিত গদ্য—এই দুই ধারার অবসান ঘটল। রবীন্দ্রনাথ চলিতকে বরণ করে নিলেন, পঞ্চাশ বৎসরের অভ্যস্ত সংস্কার ত্যাগ করে গেলেন।

'চতুরঙ্গে' কেবল বিবরণ নয়, সংলাপও সাধু ভাষায় লেখা। কিন্তু তার মধ্যে চল্‌তি ভাষার সাবলীলতা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। এ বইয়ের ভাষা সংহত, চাপা, তবু তাকে ঠেলছে ভেতর থেকে। সাধারণতঃ সাধুভাষায়—আমরা যে সব ক্রিয়াপদ ব্যবহার করি, তার ব্যবহারেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি, চল্‌তি ক্রিয়াপদকেও ঠাঁই দিলেন। ক্রিয়াপদের রূপভেদে সাধু ও চলিত ভাষার যে ব্যবধান এতদিন ছিল, তাকে তিনি ভেঙে দিলেন।

নীচের উধৃতিটি লক্ষ্য করা যাক্ ঃ

"শচীশ তামাক সাজিয়া তাঁর হাতে দিয়া তাঁর পায়েব দিকে মাটিব উপবে বসিল। স্বামী তখনই শচীশের দিকে তাঁর পা ছড়াইয়া দিলেন। শচীশ ধীরে ধীবে তাঁর পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

দেখিয়া আমার মনে এতবড় একটা আঘাত বাজিল যে, ঘরে থাকিতে পারিলাম না। বুঝিয়াছিলাম আমাকে বিশেষ করিয়া ঘা দিবাব জন্যই শচীশকে দিয়া এই তামাক-সাজানো ; এই পা টেপানো।

স্বামী বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, অভ্যাগত সকলের খিচুড়ি খাওয়া হইল। বেলা পাঁচটা হইতে আবার কীর্তন শুরু হইয়া রাত্রি দশটা পর্যন্ত চলিল।

রাত্রে শচীশকে নিরালা পাইয়া বলিলাম, "শচীশ জন্মকাল হইতে তুমি মুক্তিব মধ্যে মানুষ, আজ তুমি এ কী বন্ধনে নিজেকে জড়াইলে। জ্যাঠামশায়েব মৃত্যু কি এতবড় মৃত্যু।"

এই উদ্ধৃতির নিম্নরেখ শব্দগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, সাধু ও চলিত গদ্যে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের রূপের বিভিন্নতা কী ভাবে অগ্রাহ্য হয়েছে। চলতি ভাষার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে উন্মুখ হয়ে উঠেছেন পূর্বধৃত উধৃতিগুলিতে যে প্রবণতা ছিল, তা যে সীমা লঙ্ঘন করে যেতে চাইছে, তা এ থেকে অনায়াসেই বোঝা

যায়। 'চতুরঙ্গের' সংহত কাটছাঁট বাক্য যে ভেতরে ভেতরে আবেগে উদ্দাম হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ—এর পরই রবীন্দ্রনাথকে লিখতে হলো 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের বাহন আগাগোড়াই চলতি ভাষা। তাতে রবীন্দ্রনাথ যেন চলতি গদ্যের তরঙ্গ বাজিয়ে গেলেন। 'চতুরঙ্গের' সংহতি ও সংযম থেকে আমরা মুহূর্ত মধ্যে উত্তীর্ণ হলেম উচ্ছলতা ও ঘূর্ণিপ্রবাহে। এ উচ্ছলতা চলতি গদ্যের, এ ঐশ্বর্য ভাষার ঝকমকে অলংকারে—বিরোধাভাসে, অনুপ্রাসে, যমকে, শ্লেষে। 'ঘরে বাইরের' সূচনাতেই আমরা এই উচ্ছ্বাস, অতিরিক্ত অলংকরণ লক্ষ্য করি। চলতি ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ যে সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনেছেন তা বোঝাবার জন্য হয়ত বা এই অতিরিক্ততার চমক লাগিয়েছেন। বাংলা গদ্যের মুক্তিসাধনে 'ঘরে বাইরে' তাই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রইল। এ উপন্যাসের সূচনাটি লক্ষ্য করা যাক্ঃ "মাগো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, সেই লালপেড়ে শাড়ী, সেই তোমার দু'টি চোখ—শান্ত, স্নিগ্ধ, গম্ভীর। সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণরাগরেখার মতো। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মতো ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্ম-মুহূর্তে সেই যে ঊষা সতীর দান; দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার?" এই স্টাইল সম্পূর্ণভাবেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। প্রশ্নভঙ্গির বাহুল্য, হ্রস্ব বাক্য, উপমার আতিশয্য, 'সেই' ও 'সে যে' পদের বহুলতা—এগুলি হয়ত সরকারী ভাবে চলতি গদ্য রচনার প্রথম প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া যখন রবীন্দ্রনাথ সামলে গেলেন, তখন তিনি 'শেষের কবিতা'র অর্থালংকারের মোহে, ঔজ্জ্বল্যে ধরা দিলেন—ভাষাপ্রসাধনে মন দিলেন।

সে কথা আলোচনার আগে দুটি বিষয় স্মর্তব্য। 'ঘরে-বাইরে'তে দেখেছি চলতি গদ্যের ঐশ্বর্য। প্রাক্-সবুজপত্র পর্বে আমরা সাধু গদ্যের ঐশ্বর্যময় রূপ প্রত্যক্ষ করেছি 'প্রাচীন সাহিত্য', বিচিত্র প্রবন্ধ', 'স্বদেশ' প্রবন্ধ পুস্তকে। সাধু গদ্যের ঐশ্বর্যরূপকে একবার মাত্র 'ঘরে-বাইরে'র চলতি ভাষার ঐশ্বর্যরূপের পাশে

উপস্থিত করতে চাই। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র 'কেকাধ্বনি' (রচনা ঃ ১৩০৮ বাং —ইং ১৯০১) প্রবন্ধের একটি অনুচ্ছেদ এখানে তুলে দিলাম ঃ "কেকারব কানে শুনিতে মিষ্ট নহে, কিন্তু অবস্থান বিশেষে সময়বিশেষে মন তাহাকে মিষ্ট করিয়া শুনিতে পারে, মনের সেই ক্ষমতা আছে। সেই মিষ্টতার স্বরূপ কুহুতানের মিষ্টতা হইতে স্বতন্ত্র, নববর্ষাগমে গিরিপাদমূলে লতাজটিল প্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে যে মত্ততা উপস্থিত হয়, কেকারব তাহারই গান। আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালীবনের দ্বিগুণতর-ঘনায়িত অন্ধকারে মাতৃস্তন্যপিপাসু ঊর্ধ্ববাহু শত সহস্র শিশুর মতো অগণ্য শাখা-প্রশাখার আন্দোলিত মর্মরমুখর মহোল্লাসের মধ্যে, রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটি কাংস্যক্রেংকার-ধ্বনি উত্থিত করে, তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে। কবির কেকারব সেই বর্ষার গান, কান তাহার মাধুর্য্য জানে না, মনই জানে। সেইজন্যই মন তাহাতে অধিক মুগ্ধ হয়। মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকখানি পায়, সমস্ত মেঘাবৃত আকাশ, ছায়াবৃত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর, বিপুল মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দরাশি।"

এই অংশে গুরুগম্ভীর সংস্কৃতপ্রধান ভাষার ধ্বনিরোল আমাদের হৃদয়ে যে দোলা দেয়, তাকে কোনোক্রমেই 'সাধু' গদ্য বলে দূরে ঠেলে রাখতে পারি না।

আর একটি কথা। রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসর বয়সে—সবুজপত্র-পর্বের ঠিক আগে—'জীবনস্মৃতি' (১৯১২) রচনা করেন। এর ভাষা সাধু গদ্য। তবু এতে যে নমনীয়তা, সাবলীলতা ও প্রাখর্য আছে, তা বিস্ময়কর। 'জীবন-স্মৃতির' স্টাইল একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথেরই। এবিষয়ে শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করি ঃ "রবীন্দ্রনাথের মধ্য বয়সে লিখিত এই বইখানি রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যমণির মতো দুলিতেছে। ইহার পূর্ব্বের ও পরের রবীন্দ্রনাথের স্টাইল সম্বন্ধে লোকের মতভেদ হইতে পারে। কিন্তু জীবনস্মৃতির স্টাইল সম্বন্ধে শত্রু-মিত্র সকলে একমত। এই বইখানিতে কবি সকলের মন হরণ করিয়া লইয়াছেন।" (রবীন্দ্রকাব্য নির্ঝর ঃ পৃঃ ৯)। জীবনস্মৃতির সূচনা থেকে কয়েকটি ছত্র তুলে দিয়ে স্টাইলের সাক্ষাৎ পরিচয় দিচ্ছি ঃ "স্মৃতির পটে জীবনের ছবিকে আঁকিয়া

যায় জানি না। কিন্তু যে-ই আঁকুক, সে ছবি-ই আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে। তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কতো বড়োকে ছোট করে, ছোটোকে বড় করিয়া তোলে। সে আগের জিনিষকে পাছে ও পাছের জিনিষকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত তাহাব কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়। কয়েক বৎসব পূর্বে একদিন কেহ আমাকে আমার জীবনের ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে একবাব এই ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম জীবনবৃত্তান্তের দুইচাবিটি মোটামুটি উপকবণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু দ্বার খুলিযা দেখিতে পাইলাম জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে, তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকবের স্বহস্তেব রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা বঙ পড়িযাছে তাহা বাহিরেব প্রতিবিম্ব নহে, সে রঙ তাহাব নিজের ভাণ্ডারেব, সে রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিযা লইতে চাহিয়াছে, সুতরাং পটেব উপর যে ছাপ পড়িযাছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।" তারপব বিশ বছর বয়স পর্যন্ত যে জীবন, সে পর্বের আনন্দবেদনা মিশ্রিত স্মৃতিচিত্রগুলি অননুকবণীয় ভাষায এঁকে গেছেন।

ভাবলে আশ্চর্য লাগে, সাধু গদ্যের পরিপূর্ণ ও মহৎ রূপটি আয়ত্তে পাবাব পর রবীন্দ্রনাথ চিরদিনের জন্য তাব চর্চা ছাড়লেন। যিনি প্রাচীন সাহিত্য, বিচিত্র প্রবন্ধ, জীবনস্মৃতি লিখেছেন, তিনি যে আব কোনদিন সাধু গদ্যেব চর্চা করলেন না একথা ভাবতেও কষ্ট হয। তবু তাই সত্যি। 'ঘবে-বাইবে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ চলতি গদ্যকেই মেনে নিলেন এবং শিরোপা দিলেন। এই ভাষা তাঁর পরবর্তী সকল গদ্য রচনায় দেখা গেছে। 'গল্পগুচ্ছে'ব তৃতীয় খণ্ডে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায। 'অতিথি' বা 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের অপূর্ব সমৃদ্ধ সাধু গদ্যকে রবীন্দ্রনাথ অবলীলাক্রমে পিছনে ফেলে এলেন। চলতি গদ্যে লিখলেন 'স্ত্রীর পত্র' (শ্রাবণ, ১৩২১ বাং। ১৯১৪ ইং)। এই পত্রটি কেবল নারীর মর্যাদা ও অধিকার ঘোষণা করেছে, তা নয়, গল্পরাজ্যে ভাবে ও ভাষায় মূর্তিমান বিদ্রোহরূপে দেখা দিয়েছে। এর ভাষার এমন

একটি পার্থক্য ও তীক্ষ্ণতা আছে যা আমাদের প্রতি ছত্রেই সচেতন করে তোলে। সূচনা থেকে একটু তুলে দিচ্ছি; "আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে, আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখিনি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি—মুখের কথা অনেক শুনেছো, আমিও শুনেছি। চিঠি লেখবার মত ফাঁকটুকু পাওয়া যায়নি। আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাজে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে সম্বন্ধ কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই, সে তোমার দেহ-মনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে। তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না। বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল; তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন। আমি তোমাদের মেজবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজবউয়ের চিঠি নয়।"

এই চলতি গদ্য—কথ্যভাষা হয়েও পুরোপুরি মুখের কথা নয়। সাহিত্যিক চলতি ভাষার যথার্থ রূপটি এখানে প্রকাশ পেয়েছে। এই ভাষায় একটি সযত্ন প্রসাধনের ও শালীন প্রকাশের পরিচয় পাই। 'ঘরে-বাইরে'র চলতি ভাষায় যে আড়ম্বর, তা প্রথম প্রকাশের আড়ম্বর। অলংকারের সেখানে বাহুল্য, প্রসাধন সেখানে উগ্র। কিন্তু এই ভাষায় সেই উগ্রতা ও আতিশয্য দূর হয়েছে। এই গল্পেরই আর ক'টি ছত্র লক্ষ্য করা যাক; "যেমন করেই রাখ, দুঃখ যে আছে একথা মনে করবার কথাও কোনোদিন মনে আসেনি। আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়ালো, মনে ভয়ই হ'ল না। জীবন আমাদের কীই বা যে মরণকে ভয় করতে হবে? আদর যত্নে যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত করেছে মরতে তাদেরই বাধে। সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তাহলে আলগা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড় সুদ্ধ আমি তেমনি করে উঠে আসতুম। বাঙালির মেয়ে তো কথায় কথায় মরতে যায়। কিন্তু, এমন মরায় বাহাদুরিটা কী। মরতে লজ্জা হয়, আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ।" ('স্ত্রীর পত্র')। এখানে লক্ষ্যণীয় কী নৈপুণ্যে নিরুচ্ছ্বাসকণ্ঠে এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন।

এরপর 'পয়লা নম্বর' (আষাঢ়, ১৩২৪। ইং ১৯১৭), 'পাত্র ও পাত্রী' (পৌষ, ১৩২৪) প্রভৃতি পরবর্তী গল্প এই চলতি গদ্যেই লেখা হয়েছে।

রবীন্দ্র-গদ্যের বিবর্তনে এর পর নাম করতে হয় 'লিপিকা' (১৯২২) বইটির। এর কথিকাগুলি 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় ১৯১৯-২০এ প্রকাশিত হয়। গদ্য ও পদ্যের সীমানায় অবস্থিত এই বইটি গদ্যছন্দের অগ্রদূত। সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এখানে দেখব এর ভাষার সাবলীলতা ও প্রাখর্য। রবীন্দ্রনাথ যে কী পরিমাণ গ্রহণশীল ও উদার ছিলেন, তার প্রমাণ এ বইয়ের ভাষা। সংস্কৃত শব্দ থেকে দেশী বিদেশী শব্দ নির্বিচারে সব কিছুই প্রয়োজন মতো তিনি এখানে গ্রহণ করেছেন, অথচ কোথাও ভাষার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নি, স্ল্যাং-এ পরিণত হয় নি।

সংস্কৃতপ্রধান ভাষার নমুনা : "সেই আকাশ পৃথিবীর বিবাহ-মন্ত্রগুঞ্জন নিয়ে নববর্ষা নামুক আমাদের বিচ্ছেদের 'পরে। প্রিয়ার মধ্যে যা অনির্বচনীয় তাই হঠাৎ-বেজে-ওঠা বীণার তারের মতো চকিত হয়ে উঠুক। সে আপন সিঁথির পরে তুলে দিক্ দূর বনান্তের রংটির মতো তার নীলাঞ্চল। তার কালো চোখের চাহনীতে মেঘ-মল্লারের সব মীড়গুলি আর্ত হয়ে উঠুক। সার্থক হোক বকুলমালা তার বেণীর বাঁকে বাঁকে জড়িয়ে উঠে।" ('মেঘদূত')

দেশী শব্দ-প্রয়োগের নমুনা :

"এ হাওয়ার আগে ছুটতে চায়, অসীম অকালকে পেরিয়ে যাবে বলে পণ করে বসে। অন্য সকল প্রাণী, কারণ উপস্থিত হলে দৌড়য় ; এ দৌড়য় বিনা কারণে ; যেন তার নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত সখ। কিছু করতে চায় না, কাউকে মারতে চায় না, পালাতে চায়। পালাতে পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম্ হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তার পরে না হয়ে যাবে, এই তার মৎলব।" ('ঘোড়া')

বিদেশী শব্দ প্রয়োগের নমুনা :

"কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ প্রশ্নকে ঠেকানো যায় না : 'খাজনা দেব কিসে ?' শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হাহা করে তার উত্তর আসে, 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান্ দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে'।" ('কর্তার ভূত')

একটা বিষয় এখানে লক্ষ্য করার আছে। কি সংস্কৃত, কি দেশী, কি বিদেশী—যে শব্দই প্রযুক্ত হোক না কেন, হয়েছে তার প্রয়োগ অপরিহার্য বলে, জোর করে আসেনি, আর চলতি ভাষার চাল কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নি।

রবীন্দ্র-গদ্যধারার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি ‘শেষের কবিতা’ (১৯২৯) উপন্যাসের ভাষা ও স্টাইল সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা দরকার। ১৯২৮-২৯ এর তর্কপূর্ণ সাহিত্যিক আবহাওয়ায় এই উপন্যাসের জন্ম—‘কল্লোল’-গোষ্ঠী ও ‘কল্লোল’-বিরোধী-গোষ্ঠীর বাদ প্রতিবাদ থেকে এই উপন্যাস প্রেরণা পেয়েছে, একথা অনস্বীকার্য। রচনার স্টাইল ও ভাষা তর্কের অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল। ‘শেষের কবিতা’র ভাষা বাংলা গদ্যে কারুশিল্পের চরম নমুনা। সত্তর বছর বয়সে হাওয়া-বদলের ঘূর্ণিতে থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ দিলেন, তিনি আধুনিক প্রগতিশীল ও পরিবর্তনশীল। ‘শেষের কবিতা’র ভাষা আমাদের মনকে ধাক্কা দিয়ে সচেতন করে তোলে। ভাষার মধ্যে ক্রিয়াপদের বিরলতা, কথ্যভাষার ক্রিয়াপদ ও শব্দ নিঃসংকোচে গ্রহণ, বাক্য-বিন্যাসে মাঝে মাঝে ব্যুৎক্রম, এপিগ্রামের ছড়াছড়ি। এত সবের মাধ্যমে চলিত গদ্যকে রবীন্দ্রনাথ দৌড় করালেন, বেঁকিয়ে হেলিয়ে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে—তৎসম থেকে দেশী, তদ্ভব থেকে বিদেশীতে লাফ দিয়ে গদ্যের জন্য [illegible] পরিবর্তন এনে দিলেন। ‘ঘরে বাইরে’তে (১৯১৬) যে ভাষা পরীক্ষা শুরু হয়েছিল তার চরম ফল প্রকাশ পেল ‘শেষের কবিতা’য় (১৯২৯)। ‘শেষের কবিতা’র সংলাপে এমন ঔজ্জ্বল্য ও প্রাখর্য রবীন্দ্রনাথ সঞ্চারিত করেছেন যা আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, মনে হয় নোতুন ভাবে কথা বলার উৎসাহেই কথা বলা হয়েছে। বোধ করি এ জন্যই কোনো প্রখ্যাত সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন, শেষের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ গল্পের মোড়কে এপিগ্রাম চানাচুর উপহার দিয়েছেন।

‘শেষের কবিতা’র নায়ক অমিতের কথায় এই তীক্ষ্ণাগ্র সংলাপের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। যোগমায়াকে অমিত বলছে, “আপনি ছিলেন তাঁর লাভের বউদিদি, আমার হবেন লোকসানের মাসিমা ; মায়ের কোলে জন্মেছি। মাসির জন্যে কোনো তপস্যাই করিনি—গাড়ি ভাঙ্গাটাকে সৎকর্ম বলা চলে না, অথচ এক নিমেষে দেবতার বরের মতো মাসি জীবনে অবতীর্ণ হলেন,—এর

পিছনে কত যুগের সূচনা আছে ভেবে দেখুন।" এই সাজানো বাক্যবিন্যাসের পেছনে কতটা আন্তরিকতা আছে, আর কতটা চমক লাগানোর প্রয়াস আছে তা বিবেচ্য। তবু 'শেষের কবিতা' এই উজ্জ্বল প্রখর লাস্যময় নৃত্যচঞ্চল ভাষার জন্যই পছন্দ করি, একথা বলা খুব অন্যায় হবে না। অমিত রায়ের কথায় এপিগ্রামের ছড়াছড়ি, সেগুলি তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ত এবং অর্থসমৃদ্ধ। কয়েকটি উদাহরণ নিন্: 'সভ্যবপবের জন্য সব সময়েই প্রস্তুত থাকা সভ্যতা'; 'বর্বরতা পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত' 'সময় যাদের বিস্তর তাদের পাংচুয়াল্ হওয়া শোভা পায়'; 'যে ছুটি নিয়মিত, তাকে ভোগ করা আর বাঁধা পশুকে শিকার করা, একই কথা। ওতে ছুটির রস ফিকে হয়ে যায়', 'নামের দ্বারা বর যেন ঘরকে ছাড়িয়ে না যায়, আর রূপের দ্বারা কনেকে'; 'মেনে নেওয়া আর মনে নেওয়া, এ দুই-এ তফাৎ আছে'; 'পৃথিবীতে আজকের দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না'; এ-তো গেল অমিত রায়ের কথা। কিন্তু লেখকের বর্ণনা, তাতেও এই লক্ষণগুলি প্রকট। শিলং পাহাড়ে বর্ষাগমের বর্ণনা: "তাই ও যখন ভাবছে পালাই পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে শিলেট শিলচরের ভিতর দিয়ে যেখানে খুশি, এমন সময় আষাঢ় এল পাহাড়ে পাহাড়ে—বনে বনে তার সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে। খবর পাওয়া গেল, চেরাপুঞ্জীর গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে, এইবার ঘনবর্ষণে গিরি নির্ঝরিণীগুলোকে খেপিয়ে কুলছাড়া করবে।" এই বর্ণনার নিম্নরেখ শব্দগুলিতে তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। সাধু স্টাইলকে অস্বীকার করবো বললেই করা যায় না তার প্রমাণ এই বর্ণনা। কিন্তু লক্ষ্য করুন নরেন মিটারের বর্ণনা:

"দীর্ঘকাল য়ুরোপে ছিল। জমিদারের ছেলে, আয়ের জন্য ভাবনা নেই, ব্যয়ের জন্যেও; বিদ্যার্জনের ভাবনাও সেই পরিমাণে লঘু। বিদেশে ব্যয়ের প্রতিই অধিক মনোযোগ করেছিল, অর্থ এবং সময় দুই দিক থেকেই। নিজেকে আর্টিস্ট বলে পরিচয় দিতে পারলে একই কালে দায়মুক্ত স্বাধীনতা ও অহৈতুক আত্মসম্মান লাভ করা যায়। এইজন্য আর্ট সরস্বতীর অনুসরণে য়ুরোপের অনেক বড়ো বড়ো শহরের বোহেমীয় পাড়ায় সে বাস করেছে। চিত্রকলাকে

সে ফলাতে পারে না—কিন্তু দুইহাতে চটকাতে পারে।…তার আয়নার টেবিল প্যারিসীয় বিলাস বৈচিত্র্যে ভারাক্রান্ত।…এর উপরে ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা এবং বিলিতি শপথের দুর্বাক্য সম্পদে সে তার দলের লোকের আদর্শ পুরুষ।"

বাংলা সাহিত্যে নোতুনের দাবী অমিত তুলেছিল এই কথায়ঃ

"চাই কড়া লাইনের খাড়া রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো, ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো, ন্যুর‍্যালজিয়ার ব্যথার মতো, খোঁচাওয়ালা, কোণওয়ালা, গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়, এমন কি চটকল পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিল্‌ডিঙ্‌য়ের আদলে নয়, ক্ষতি নেই।"

'শেষের কবিতা'র স্টাইল এই কয়টি উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে। শব্দ প্রয়োগে ও শব্দ গঠনে (যথা—'বন্ধুনি', 'ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা', 'শাড়িটা গায়ে তির্যগ্‌ভঙ্গীতে ল্যাপ্টানো', 'বিল্‌ডিঙের আদলে') রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য সংস্কারমুক্তি ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

সাম্প্রতিক কালের কথাসাহিত্যে ও প্রবন্ধে যে স্টাইল দেখা যায়, তা বহুল পরিমাণেই 'শেষের কবিতা'র এই স্টাইলের কাছে ঋণী। কিন্তু এই চরম চমক লাগানো ম্যাজিক-বিদ্যা দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। সাধু গদ্যে তিনি আর ফিরে যান নি, কিন্তু বাংলা গদ্যের ভিত্তিভূমি যে তৎসম শব্দ-প্রধান, তা অস্বীকার করেন নি।

বর্তমান শতকের চতুর্থ দশকে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ দুটি উপন্যাস লেখেন, তার একটি হলো 'মালঞ্চ' (১৯৩৩)। রবীন্দ্রনাথ শেষ তিনটি উপন্যাসে (দুইবোন-মালঞ্চ-চার অধ্যায় পর্বে) একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে—তা হল বাক্যের হ্রস্বতা, ক্রিয়াপদ ও কর্তার ব্যুৎক্রম ও সংলাপের অ-সাধারণতা। এর সূচনা 'চতুরঙ্গে', বিকাশ 'শেষের কবিতা'য়, পরিণতি শেষ 'ত্রয়ী' উপন্যাসে। এদের ভাষায় কবি জাদু লাগিয়েছেন। প্রায়শই লিরিক গুণটি প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু 'মালঞ্চ' উপন্যাসের পরিণতি যেমন নিষ্ঠুর, ভাষাও তেমনি তীক্ষ্ণাগ্র। এর পরিণতিতে যেমন রোমাঞ্চকতার

প্রশ্রয় নেই, ভাষাতেও নেই লিরিকের নমনীয়তা। 'মালঞ্চে'র গোড়াকার বর্ণনাটা এই মন্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করে :

"পিঠের দিকে বালিশগুলো উঁচু করা। নীরজা আধশোওয়া পড়ে আছে রোগশয্যায়। পায়ের উপরে সাদা রেশমের চাদরটানা, যেন তৃতীয়ার ফিকে জ্যোৎস্না হালকা মেঘের তলায়। ফ্যাকাসে তার শাঁখের মতো রং, ঢিলে হয়ে পড়েছে চুড়ি, রোগা হাতে নীল শিরার রেখা, ঘনপক্ষ্ম চোখের পল্লবে লেগেছে রোগের কালিমা।"

আরেকটু বর্ণনা নিই :

"বাজল দুপুরের ঘণ্টা। মালীরা গেল চলে। সমস্ত বাগানটা নিজন। নীরজা দূরের দিকে তাকিয়ে রইল, যেখানে দুরাশার মরীচিকাও আভাস দেয় না। যেখানে ছায়াহীন রৌদ্রে শূন্যতার পরে শূন্যতার অনুবৃত্তি।"

এই স্টাইলে লক্ষ্য করা যায় বাক্যের সংক্ষিপ্ততা, ঋজুতা ক্রিয়াপদের স্থান পরিবর্তন, তৎসম শব্দের প্রাচুর্য। প্রাক্-সবুজপত্র পর্বের তৎসম শব্দের প্রাধান্য এখানে কথ্যভাষার প্রবাহে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

জীবনের শেষ প্রান্তে রবীন্দ্রনাথ দু'টি গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন যা ভাষা বিচারে —স্টাইলের পরিণতি বিচারে উল্লেখযোগ্য। এ দুটি হল : 'ছেলেবেলা' (১৯৪০) ও 'সভ্যতার সংকট' ভাষণ (১৯৪১)।

'ছেলেবেলা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ওটি রচনা করেছি বালভাষিত গদ্যে'। এই গদ্যের প্রবহমানতা ও দ্যুতি লক্ষ্য করে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। এই স্মৃতিকথার সূচনায় কবি বলেছেন, "আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কল্‌কাতায়। শহরে শ্যাক্‌রাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়ছড় করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বেরকরা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটর গাড়ি। তখন কাজের এত বেশি হাঁসফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবতে চিবতে, কেউবা পালকি চড়ে, কেউ বা ভাগের গাড়িতে। যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা আঁকা, চামড়ার আধঘোমটাওয়ালা, কোচবাক্সে কোচমান বসত মাথার পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে,

কোমরে চামর বাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাইরে যাওয়া আসা ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাঁপধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারি লজ্জা। রোদ বৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না।"

এখানে রবীন্দ্রনাথ কথ্যভাষাকে স্ল্যাং সমেত সাহিত্যের দরবারে এনেছেন। কথ্যভাষার বাগ্‌ভঙ্গী, তার ক্রিয়াপদ, বিশেষণ, তৈরী-করা যুগ্মশব্দ: সবই এখানে রয়েছে।

অশীতিবর্ষ-পূর্তি উৎসবের অভিভাষণে—'সভ্যতার সংকট'-এ (১৯৪১)—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে, সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।....ভাগ্যচক্রের পবিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতাব আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসন ধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পংকশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে।"

এখানে দীর্ঘ প্রসারিত বাক্যের পুনবাবির্ভাব ও তৎসম-তদ্ভব শব্দের বহুল প্রয়োগ ঘটেছে। কিন্তু চলতি ক্রিয়াপদ প্রয়োগের দ্বারা এর সাবলীল গতিটি বজায় রাখা হয়েছে। এই সমন্বয় সাধনে রবীন্দ্র-গদ্য পূর্ণতা লাভ করেছে।

সাবলীলতা রবীন্দ্র-গদ্যের প্রাণবস্তু। অলংকরণের বা চমক লাগানোর প্রয়াস কখনো এই সাবলীলতাকে ক্ষুণ্ণ করে নি। আঠারো থেকে আশি বছর বয়স পর্যন্ত যে দীর্ঘ সাহিত্যজীবন, তা বাংলা গদ্যেব ইতিহাসে আপন স্বাক্ষর রেখে গেছে।

বিবেকানন্দ

কাব্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্বীকৃতি লাভ করেছে উনিশ শতকেই। কিন্তু গদ্যের ক্ষেত্রে সে-স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন বিশ শতকে। 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকেরা জানেন, কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'র লুব্ধ পাঠক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে উপন্যাস ও প্রবন্ধে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা মূলতঃ বঙ্কিমী ভাষা। 'মানসী' (১৮৯০) কাব্যে রবীন্দ্রনাথ উনিশ-শতকী কাব্য-ঐতিহ্য অস্বীকার করে স্বতন্ত্র পথে যাত্রা করেছিলেন। বঙ্কিম-প্রভাবকে অস্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ চল্‌তি ভাষাকে ব্যবহার করেন 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে (১৯১৬), এর আগে তিনি ভ্রমণ-ডায়েরী লিখেছেন পত্রাকারে চল্‌তি ভাষায়, কিন্তু তা সাহিত্যের প্রকাশ্য দরবারের উদ্দিষ্ট নয়। তাই একথা নির্ভয়ে বলা যায়, উনিশ শতকের শেষ পাদের গদ্যলেখকেরা কোনক্রমেই রবীন্দ্র-প্রভাবে প্রভাবিত নন, যদিও কবিরা প্রভাবিত হয়েছেন।

তবে একথা বলা যায়, উনিশ শতকের গদ্যলেখকরা অল্পবিস্তর বঙ্কিম-প্রভাবে প্রভাবিত। বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাব, উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বগ্রাসী প্রভাব। এই দুই সাহিত্যনায়কের প্রবল অভিভব থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছেন, এমন গদ্যলেখকের সংখ্যা খুবই কম। স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯৩২) সেই বিরল গদ্যলেখকদের একজন।

স্বামী বিবেকানন্দের লেখক-খ্যাতি তাঁর ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসী কর্মীপুরুষের সুবিপুল খ্যাতির ভারে চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু বিবেকানন্দকে গদ্যশিল্পী হিশেবে বিশেষভাবে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

উনিশ শতকে ও বিশ শতকে আজ পর্যন্ত বাংলা গদ্যের দুটি প্রবল ধারা চলে এসেছে। দুই ধারাতেই কৃতী গদ্যশিল্পীরা দেখা দিয়েছেন। একেবারে গোড়ার দিকে কথ্যভাষাকে সাহিত্যের দরবারে মর্যাদা দেবার জন্য লড়াই করেছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র (ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর), রাধানাথ শিকদার এবং

কালীপ্রসন্ন সিংহ (ওরফে হুতোম)। ১৮৫৪ সালে প্যারীচাঁদ ও রাধানাথ "মাসিক পত্রিকা" প্রকাশ করলেন এই উদ্দেশ্যে—"যে ভাষায় আমাদিগের সচবাচর কথাবার্ত্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক।" বিদ্রোহের ফল "আলালের ঘরের দুলাল" (১৮৫৮)। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্যারীচাঁদ ও রাধানাথ এই বিদ্রোহ বেশীদিন রাখতে পারলেন না। উভয়েই গুরুগম্ভীর সংস্কৃতানুসারী সাধুভাষায় গ্রন্থ রচনা করলেন। তার প্রমাণ, প্যারীচাঁদ মিত্রের সাধুভাষায় লিখিত 'যৎকিঞ্চিৎ', 'অভেদী', 'আধ্যাত্মিকা' প্রমুখ গ্রন্থ।

এরপর ১৮৬২ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" রচনা করলেন। সামাজিক স্যাটায়ার হিসেবে এটি উৎকৃষ্ট। এর ভূমিকায় তিনি কথ্যভাষার গুণগান করেছেন ও সাহিত্যের দরবারে একে ঠাঁই দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনিও শেষরক্ষা করলেন না, গুরুগম্ভীর সংস্কৃতানুসারী ভাষায় মহাভারতের বিপুল অনুবাদ-কর্ম সম্পন্ন করলেন।

আসলে এঁদের মনের মধ্যেই চলতি ভাষা সম্পর্কে একটা দ্বিধা ও সঙ্কোচ ছিল। মুখে বললেও মনে-মনে হয়ত কথ্যভাষাকে সাহিত্যের একমাত্র বাহন বলে স্বীকার করতে পারেন নি।

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থকনামা শিল্পী। সংস্কৃতসাহিত্যের অতিশয় পেলব ও মার্জিত, শুদ্ধ ও সংযত রসনৈপুণ্যের সংগে আধুনিক মনোবৃত্তি অনুযায়ী যুক্তিনিষ্ঠা ও সাবলীলতা,—এ দুয়ের মিলন ঘটেছে বিদ্যাসাগরের গদ্যে। বিদ্যাসাগর গদ্যছন্দকে আবিষ্কার করেন। বাংলা গদ্যের ধ্বনি-প্রকৃতিকে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। প্রথম তাঁর রচনায় আমরা সাহিত্য-গুণসমৃদ্ধ বাংলা গদ্য পেলাম। 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭), 'শকুন্তলা' (১৮৫৪), 'সীতার বনবাস' (১৮৬০) প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা সাহিত্যরস আস্বাদন করলাম। তিনিও চলতিভাষা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। তাঁকে ভাষার ক্ষেত্রে যতটা গোঁড়া রক্ষণশীল বলা হয় ততটা তিনি ছিলেন না। তবে এ বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট দ্বিধা ছিল, তাই তিনি ছদ্ম নামে চলতি গদ্য লেখেন। স্বনামে লেখার সাহস হয়ত সঞ্চয় করে উঠতে পারেন নি। "কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য" নামে বিদ্যাসাগর

'অতি অল্প হইল' ও 'আবার অতি অল্প হইল' দুটি বই লেখেন। এ বই দুটির স্টাইল চলতি ভাষার, কাঠামো সাধুভাষার।

তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার দুন্দুভি বাজিয়ে তিনি তাঁর আগমনবার্তা ঘোষণা করলেন ও অচিরেই একটি অনুরক্ত লেখক গোষ্ঠীর একচ্ছত্র নায়করূপে দেখা দিলেন। উনিশ শতকের শেষ পাদে তিনিই বাংলা-সাহিত্য-সংসারে রাজত্ব করে গেছেন। তাঁর প্রভাব যাঁরা কাটিয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের অন্যতম স্বামী বিবেকানন্দ।

দুঃখের বিষয় স্বামী বিবেকানন্দ বাংলায় খুব কমই লিখেছেন। তাঁর বেশীর ভাগ রচনা ও বক্তৃতা ইংরেজিতেই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলায় চারখানি বই আছেঃ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, 'ভাববার কথা,' 'বর্তমান ভারত' ও 'পরিব্রাজক'।

বিবেকানন্দের গদ্য রচনা পড়লে একটি কথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হয়। 'Style is the man'—এই কথার যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে বিবেকানন্দের গদ্যে। তাঁর গদ্যে যে অনায়াসগামিতা, সাবলীলতা স্বচ্ছন্দতা ও পরিহাসপ্রিয়তার পরিচয় পাই, তার উৎস স্বামীজীর জীবন।

বিবেকানন্দ সাধু ও চলিত—ভাষার এই দুই রূপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট চিন্তাও করেছিলেন। সাধু ও চলিত গদ্যের বিবোধ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা তিনি করেছিলেন।

গুরুভার সাধুগদ্যের চর্চা যে তিনি করেন নি, তা নয়। 'বর্তমানভারত' গ্রন্থের বক্তৃতাবলী সাধু ভাষায় রচিত। তবে সেখানেও দেখি ভাষার অনায়াসগামিতা ও বেগ। স্বদেশ-মন্ত্র প্রবন্ধের সূচনায় বলেছেনঃ "বাহ্যজাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে। এই অল্প জাগরূকতার ফলস্বরূপ স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ। একদিকে প্রত্যক্ষ শক্তি-সংগ্রহ-রূপ, প্রমাণ বাহন, শতসূর্য্য জ্যোতিঃ আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি প্রতিঘাতী প্রভা; অপরদিকে স্বদেশী-বিদেশী বহু মনীষীর উদ্‌ঘাটিত, যুগযুগান্তের সহানুভূতিযোগে

সর্ব্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্ব্ব-পুরুষদিগের অপূর্ব্ব বীর্য্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্ল্লভ অধ্যাত্মতত্ত্বকাহিনী।"

এই অংশ পড়লে মনে হয় বুঝি বা 'বেতালপঞ্চবিংশতি' বা 'দুর্গেশনন্দিনী'র অংশবিশেষ পড়ছি। কিন্তু এই লেখাই কত স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ এই প্রবন্ধেই রয়েছে: "হে ভারত ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর।......হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" এই অংশের ভাষায় যে প্রবাহ, তা গুরুভার রচনা নীতির সমস্ত আড়ষ্টতাকে দূরে ফেলেছে।

বিবেকানন্দ যে সাবলীল সাধু গদ্যরচনা করেই তৃপ্ত ছিলেন না, তিনি যে কথ্যভাষাকে সাহিত্য-মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন তার প্রমাণ 'পরিব্রাজক' ভ্রমণ-গ্রন্থটি। এতে তিনি চলিতি ভাষাই ব্যবহার করেছেন।

এ বিষয়ে যে তিনি ভেবেছিলেন, তার পরিচয় রয়েছে 'ভাববার কথা' গ্রন্থে। সেখানে তিনি বলছেন: "স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না, সেই ভাব, ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈয়ারী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ ইস্পাত, মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে যা ইচ্ছে কর—আর যে কে সেই, একচোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতের গদাই লস্করি চাল—ঐ একচাল—নকল ক'রে অস্বাভাবিক হ'য়ে যাচ্ছে।"

'পরিব্রাজক' গ্রন্থে জাহাজে হাঙর-শিকারের সরস বর্ণনায় বিবেকানন্দের ভাষা সম্পর্কে এই সংস্কারমুক্তি ও প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে। মনে রাখা প্রয়োজন, বিশ শতকে না পৌঁছেই বিবেকানন্দ এই কথা বলেছেন।

এবার হাঙর শিকারের সামান্য বর্ণনা দিই : “সকালবেলা খাবার দাবার আগেই শোনা গেল যে, জাহাজের পেছনে বড় বড় হাঙর ভেসে বেড়াচ্ছে। জলজ্যান্ত হাঙর পূর্ব্বে আর কখন দেখা যায় নি—গতবারে আসবার সময়ে সুয়েজে জাহাজ অল্পক্ষণই ছিল, তা-ও আবার শহরের গায়ে। হাঙরের খবর শুনেই, আমরা তাড়াতাড়ি উপস্থিত। সেকেণ্ড কেলাশটি জাহাজের পাছার উপর। সেই—ছাদ হ'তে বারান্দা ধরে কাতারে কাতারে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে ঝুঁকে হাঙর দেখেচে। আমরা যখন হাজির হলুম, তখন হাঙর মিঞারা একটু সবে গেচেন ; মনটা বড়ই ক্ষুণ্ণ হল।...কিন্তু নেহাৎ হুতাশ হবার প্রয়োজন নেই। ঐ যে পলায়মান 'বাঘার' গা ঘেঁষে আর একটা প্রকাণ্ড 'থ্যাবড়ামুখো' চলে আসচে।...এবার সব চুপ্—নোড়ছোড় না, আর দেখ--তাড়াতাড়ি কোরো না। মোদ্দা—কাছির কাছে কাছে থেকো। ঐ,—বঁড়শির কাছে কাছে ঘুরচে ; টোপ্‌টা মুখে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখ্‌চে ! দেখুক। চুপ্ চুপ্—এইবার চিৎ হল—ঐ যে আড়ে গিলেচে, চুপ্—গিল্‌তে দাও। তখন 'থ্যাবড়া' অবসরক্রমে আড় হয়ে টোপ উদরস্থ করে যেমন চলে যাবে, অমনি পড়লো টান ! বিস্মিত 'থ্যাবড়া', মুখ ঝেড়ে চাইল সেটাকে ফেলে দিতে—উল্‌টো উৎপত্তি !! বঁড়শি গেল বিঁধে, আর ওপরে ছেলে বুড়ো, জোয়ান, দে টান্—কাছি ধরে দে'টান্। ঐ হাঙরের মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠলো—টান্ ভাই টান্।” এই বর্ণনা এত জীবন্ত যে চোখের সাম্‌নে ঘট্‌ছে বলে মনে হয়। এই বর্ণনায় বিবেকানন্দের ভাষার উপর অসাধারণ দখল, পরিহাস-প্রবণতা ও লিপিকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই যথেষ্ট নয়। চল্‌তি ভাষার প্রাণটি তিনি যে আয়ত্ত করেছিলেন, তার প্রমাণ ও এখানে আছে। কেবল ক্রিয়াপদ ও বিশেষণের চলিত রূপের ব্যবহার নয়, চল্‌তি ইডিয়ম, দেশজ শব্দ, বিদেশী শব্দ, লাগ্‌সই উপমা নির্দ্ধিধায় তিনি প্রয়োগ করেছেন। ভাষার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন না, তাঁর প্রমাণ এই বর্ণনায় মোটা হরফের শব্দগুলি। বিশ শতকে পৌঁছাবার আগেই বিবেকানন্দ যে সাহস ও সংস্কারমুক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দুঃখের বিষয়, তিনি অকালে মারা যান ও ও সাহিত্য-চর্চা তাঁর জীবনে গৌণ ছিল, ফলে বাংলা গদ্য বঞ্চিত হয়েছে।

বিবেকানন্দের এই চলতি-ভাষা-চর্চার গুরুত্ব আরো বাড়ে যদি আমরা সেদিনের গদ্য আন্দোলনের পটভূমিকায় একে বিচার করি। আগেই বলেছি, তখনো গদ্যসাহিত্যে বঙ্কিমের রাজত্ব চলেছে। রবীন্দ্রনাথ তখন কবিখ্যাতি লাভ করেছেন, তবে গদ্যক্ষেত্রে শিরোপা পাননি। তাঁর 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র" (১৮৮১) চলতি-ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত, একথা ঠিক। কিন্তু তখনো তিনি সাহিত্যের প্রকাশ্য দরবারে চলতি ভাষাকে হাজির করতে রাজি ছিলেন না। তার প্রমাণ এই গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্রগুলি প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিতে আপত্তি ছিল; কারণ কয়েকটি ছাড়া বাকী পত্রগুলি 'ভারতী'র উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নাই, সুতরাং সে সমুদয়ে যথেষ্ট সাবধানের সহিত মত প্রকাশ করা যায় নাই।" এখানে রবীন্দ্রনাথের যে আপত্তি ও দ্বিধা রয়েছে, তা অপনোদিত হয়েছে দীর্ঘকাল বাদে, সবুজপত্রের যুগে। সুতরাং সেদিনের পটভূমিকায় বিচার করলে, গদ্যশিল্পী বিবেকানন্দের অভিমতকে বৈপ্লবিক ও তাঁর গদ্য রচনাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করা প্রয়োজন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

নেপাল রাজদরবার থেকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের লেখা চর্যাপদের পুঁথির আবিষ্কর্তা হিশেবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫৩-১৯৩১) নাম বাংলা-সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে। চর্যাপদের ভাষা বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন, আচার্য হরপ্রসাদের অনুগ্রহে তা আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু বাংলা গদ্যেতিহাসে হরপ্রসাদের বিশিষ্ট স্থান আছে, তা আমরা জানি না। বাংলা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা হিশেবে হরপ্রসাদকে স্বীকৃতি দানের সময় আজ নিশ্চয় হয়েছে।

বাংলা ভাষার প্রতি হরপ্রসাদের যে বিশেষ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল, তার একটি প্রমাণ এই, তিনি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বাংলা ভাষাকে উচ্চ শিক্ষার বাহন করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। বঙ্গদর্শনের ভাদ্র, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় প্রকাশিত হরপ্রসাদের "কালেজী শিক্ষা" প্রবন্ধটি এর পরিচায়ক। পুনশ্চ, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় বাংলা ভাষা প্রচলনের উদ্যোগ করেন বঙ্কিমচন্দ্র; তখন হরপ্রসাদ ও আশুতোষ তাঁকে সমর্থন করেন এবং আশুতোষের প্রস্তাব সিনেটে গৃহীত হয়। তবে বিশ শতকের আগে বাংলা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউড়ি পেরোতে পারে নি। মাতৃভাষাকে মর্যাদা দানের আন্দোলনে প্রথম-পদাতিক হিশেবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম তাই অবশ্য স্মরণীয়।

মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগের অপরদিক হরপ্রসাদের বাংলা গদ্যচর্চা। সাহিত্যক্ষেত্রে হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য। তাঁর প্রথম যুগের গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব পরিস্ফুট। ১৮৭৬ থেকে ১৮৮৩ঃ এই আট বৎসর হরপ্রসাদ বঙ্গদর্শনের স্বল্পসংখ্যক বিশিষ্ট লেখকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রথম দুটি গ্রন্থ—'বাল্মীকির জয়' (১৮৮১) ও 'কাঞ্চনমালা' (১৯১৬) বঙ্গদর্শনের পাতায় প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথমটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় ১৮৮০-৮১-তে, দ্বিতীয়টি ১৮৮২-৮৩-তে। এই দুই গ্রন্থের ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের আধিপত্য সুপ্রকট। সামান্য উদাহরণেই তার পরিচয় পাওয়া যায়ঃ

"গানে মুগ্ধ কে নয়? যখন সামান্য মনুষ্য গায়ক তান ছাড়িয়া গায়, তখন

কে না মুগ্ধ হয়? তাহা অপেক্ষা যখন অন্তরের উল্লাসে প্রাণ খুলিয়া গিয়া গান বাহির হয়, তখন আরও মধুর হয়, যে গীত বুঝে সে আরও মুগ্ধ, যে গীতের ভাব বুঝে, সে আরও মুগ্ধ হয়। গীতে যদি শুধু কাণ না ভরিয়া মনও ভরাইতে পারে, তাহা হইলে সে গীতে লোকে উন্মত্ত হয়। আজি ঋভুগণ গায়ক, জন্মভূমিদর্শনে পুলকে পূরিত হইয়া গাইতেছেন, হৃদয় উল্লাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকি শ্রোতা, তাঁহারা শুনিতেছেন, বুঝিতেছেন, ভাব গ্রহণ করিতেছেন। কাণ, মন, প্রাণ ভরিয়া উঠিতেছে। বাহির ইন্দ্রিয় কাণে প্রবেশ করিয়াছে। মন ও প্রাণ কাণে উঠিয়াছে। জ্ঞান চৈতন্যহত। তাঁহারা গায়কে মুগ্ধ, গায়কের ভাবে মুগ্ধ, গানে মুগ্ধ, সুরে মুগ্ধ, আর সুরের ভাবে আরও মুগ্ধ।" (বাল্মীকির জয়)।

"দুইটি ফুল সমান ফুটিয়াছে, সমান হাসিতেছে, গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিতেছে। পাশাপাশি ফুটিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া গন্ধ ছড়াইতেছে, আর হাসি ভরে একবার এ উহাকে পাপড়ী দিয়া মারিতেছে, ও আবার তাহার শোধ দিতেছে। বাতাস ইহাকে উহার গায়ে ফেলিয়া দিতেছে। বাতাস থামিলে ও আবার ইহার গায়ে পড়িয়া সরিয়া যাইতেছে। কেমন সুন্দর! এরূপ সমবিকসিত, সমগ্রপ্রস্ফুটিত, সমগন্ধামোদিত সমান কুসুমদ্বয়ের মিলন কেমন সুন্দর!" (কাঞ্চনমালা)।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যদি এই পর্যন্ত এসে থেমে যেতেন, তাঁর গদ্যরীতি (স্টাইল) যদি আর না অগ্রসর হত, তাহলে তাঁকে বঙ্কিম-অনুবর্তী গদ্যলেখক বলে বিদায় দেওয়া যেত। কিন্তু হরপ্রসাদ এখানেই ক্ষান্ত হন নি। বঙ্গদর্শনে যখন 'বাল্মীকির জয়' প্রকাশিত হচ্ছে, তখনই এই পত্রিকায় হরপ্রসাদ 'বাংলা ভাষা' (১২৮৮) নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধ পড়লে বোঝা যায়, হরপ্রসাদ এ বিষয়ে কত সচেতন ছিলেন। এই প্রবন্ধে দেখি, তিনি সাধু বা সংস্কৃত, অসাধু বা প্রাকৃত,—ভাষার ক্ষেত্রে এরূপ জাতিভেদ করেন না; স্টাইলের উপযোগিতাই তাঁর কাছে বড় কথা, এ বিষয়ে তাঁর কোনো গোঁড়ামি ছিল না।

উত্তরকালে হরপ্রসাদের এই অভিমত আরো উদার ও অগ্রসর হয়েছিল। তাঁর ভাষার স্বকীয়তা পরিস্ফুট হয়েছে 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯১৮-১৯)

'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে (গ্রন্থাকারে প্রকাশ : ১৯২০) ও শেষের দিকে লিখিত প্রবন্ধাদিতে। বঙ্কিমের ভাষার অনুসরণে হরপ্রসাদ যাত্রা শুরু করে শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব গদ্যরীতিতে (স্টাইলে) পৌঁছেছিলেন। এখানে তিনি বঙ্কিম-প্রভাবমুক্ত।

হরপ্রসাদের এই স্বকীয় স্টাইলের ভিত্তি কি? খাঁটি বাংলা কথ্যভাষা এর ভিত্তি। কথ্যভাষাকে যদি তার অনায়াসগামিতা, ক্ষিপ্রচারিতা, স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য সমেত সাহিত্যগুণোপেত করে নেওয়া যায়, তাহলে যে ভাষা পাই, তা-ই হরপ্রসাদের নিজস্ব রীতির গদ্য। এখানে মুখের ভাষাই আদর্শ, বাক্‌স্পন্দন এখানে অপ্রতিহত, তার চলার ঢঙ্‌টি একান্ত স্বভাবগত। স্বধর্মনিষ্ঠ কথ্যভাষাই হরপ্রসাদের ভাষা। এ ছাড়া আর কোনো ভাবে একে বোঝানো যায় না। লঘু, স্বচ্ছ, অনাড়ম্বর, সরল, নিরাভরণ, ক্ষিপ্রচারী, অনায়াসগামী: এই ক'টি বিশেষণ হরপ্রসাদের গদ্য সম্পর্কে প্রয়োগ করা চলে।

কিন্তু এই ব্যাখ্যাও যথেষ্ট নয়। হরপ্রসাদের স্বকীয় স্টাইলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ব্যতীত এই গদ্যের স্পন্দন অনুভব করা সম্ভব নয়। সুতরাং তত্ত্ব ছেড়ে বস্তুতে আসা যাক্। 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসের একটি পাতা:

"ভোর না হইতে হইতেই তারাপুকুরের মাছধরার সরঞ্জাম সব প্রস্তুত। পুকুরটি যতখানি চওড়া, ততখানি লম্বা। একখানি জাল, জালের সূতাগুলি বহুকাল ধরিয়া গাবানতে এমন শক্ত হইয়াছে যে, মাছের সাধ্য কি উহা ছিঁড়িয়া পালায়। জালের তলার দিকে ইট ও পাথর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপরে গোছা গোছা শোলার ফাত্‌না ভাসিতেছে। দুই পাড়ের ধারে দুই নৌকায় জেলেরা দড়ি ধরিয়া বসিয়াছে।......নৌকা চলিল, শোলার ফাত্‌না চলিল, জালের দড়ি চলিল, পাড়ের উপর অগণ্য মানুষ চলিতে লাগিল।......ক্রমে জাল তারাপুকুরের মাঝামাঝি পৌঁছিল। তখন সূর্য্যদেবের রাঙা কিরণও আসিয়া তারাপুকুরের জল সোনার রং করিয়া দিল। কিন্তু একি? জাল যে আর টানা যায় না। জালের তলায় এত মাছ পড়িয়াছে যে, দুই নৌকার জেলেরাই জাল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না। তখন জালের দড়ি নোল করিয়া দেওয়া হইল। কতকগুলি মাছ ঘাই দিয়া লাফাইয়া জালের পিছনে গিয়া পড়িল।

তাহারা যখন লাফায়, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন রূপার মাছ-বৃষ্টি হইতেছে। মাছগুলা রূপার মত সাদা, মাজা রূপার মত চক্‌চকে, একটার পর আর একটা পড়িতেছে। চক্‌চকে রূপার রঙের উপর সূর্য্যের সোনালি রং পড়িয়া গিয়াছে। সে রঙের মেশামিশিতে এক অপূর্ব্ব শোভা। জাল হাল্‌কা হইল, আবার জালটানা আরম্ভ হইল। ক্রমে জাল আসিয়া অপর পারে পৌঁছিল। এইবার জাল গুটান আরম্ভ হইল। মাছেদের এইবার মরণ-কামড়। যত জাল গুটাইয়া আনিতে লাগিল, তাহাদের লাফালাফি ততই বাড়িতে লাগিল। রূপার ঝক্‌ঝকানি ক্রমে উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম হইয়া আসিল। ক্রমে তারাপুকুর যেন একপেশে হ'য়ে দাঁড়াইল। পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ পাড়ে কোথাও লোক নাই। যেখানে জাল সেইখানেই লোক। একদিকে যেমন মাছের ঘপঘপানি, আর একদিকে তেমনি লোকের কলরব।"

এই উপন্যাসের আরেকটি পাতা ঃ

"তিনটার সময়ে রাজবাড়ীতে গাজনের সাজন হইল। মূল সন্ন্যাসীর মাথা নেড়া, লম্বা দাড়ী, গোঁপ কামান, গায়ে আলখাল্লা, তাঁহার গায়ে ছোট ছোট নানা রঙের রেশমের, পাটের, বাকলের টুকরা লাগান। তাঁহাকে রাজা আসিয়া নমস্কার করিলেন এবং তাঁহার হাত ধরিয়া একটা প্রকাণ্ড হাতীর হাওদায় তুলিয়া দিলেন। খুব সাজানো একটা হাতী, সর্ব্বাঙ্গে শিঙ্গার করা, বড় বড় রাঙা রাঙা সাদা সাদা কাল কাল ডোরা দেওয়া, তাহার উপর কিংখাপের হাওদা, হাওদার চারিদিক দড়ি দিয়া ঘেরা, খুব জাঁকাল, খুব জমকাল। রাজা গুরুদেবকে সেই হাতীতে চড়িতে ও সেই হাওদায় বসিতে বলিলেন। ক্রমে হাতী আসিয়া গুরুদেবের পদতলে উপুড় হইয়া পড়িল ও শুঁড় দিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিল। হাতীর পিঠে একটা সিঁড়ি লাগিল, সেই সিঁড়ি বাহিয়া গুরুদেব হাতীতে উঠিলেন। তাঁহার সহিত একটা ছোকরা, তেমন সুন্দর ছেলে দেখা যায় না, যেন সত্যসত্যই রাজপুত্র ; মাথাটি মুড়ান, বোধ হয়, প্রায়ই খেউরি করা হয়, গোঁপ নাই, দাড়িও নাই। রংটি যতদূর ধব্‌ধবে হইতে পারে ; চোখ দুটি পটল-চেরা ; ঠোঁট দুটি পাতলা অথচ লাল, গাল দুটি বেশ গোলগাল, দাড়িটি ক্রমে সরু হইয়া ছুঁচাল হইয়া গিয়াছে, কপালখানি ছোট, কম

চওড়া ; দুই রগের দিকে চুলগুলি একবার ভিতরের দিকে ঢুকিয়া আবার বাহিরে আসিযা কোণ করিয়া কাণের কাছে জুলপি হইয়া গিয়াছে।"

এই ভাষা হরপ্রসাদেব স্বকীয় ভাষা। এখানে তিনি অনন্য। এর ভিত্তি মুখেব ভাষা। এতে প্রথম লক্ষণীয় এর অনায়াসগম্যিতা ও প্রয়াসহীনতা। সাধারণ কথাবার্তায় যেটুকু নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ঝোঁক দরকার, তার বেশি ঝোঁক বা প্রয়াস এখানে নেই। এই গদ্যপাঠে কোনো সচেতন প্রয়াস দরকার হয় না। এই স্বাচ্ছন্দ্যেব সঙ্গে বয়েছে ক্ষিপ্রচারিতা। অথচ তার জন্য ক্রিয়াপদগুলিকে সংক্ষিপ্ত করা হয় নি। আসলে এই গদ্যের পদবিন্যাস এতো স্বাভাবিক যে কৃত্রিমতা এখানে ঠাঁই পায় নি। এই গদ্যের বাক্-স্পন্দন নিয়তই অনুভব করতে পারি। হরপ্রসাদের এই গদ্যরীতিব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীপ্রমনাথ বিশী যা বলেছেন, তা তুলে দিলেই যথেষ্ট হবেঃ "ইহাতে তৎসম, তদ্ভব ও খাঁটি দেশি শব্দ যেমন সুকৌশলে মিশ্রিত, খাপে-খাপে খোপে-খোপে কেমন জোড়া লাগিয়া গিয়াছে। ইহার তুলনায় আলালী ভাষা গ্রাম্য, বীরবলী ভাষা কৃত্রিম। এ ভাষা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারে। খাঁটি সংস্কৃতর সঙ্গে খাঁটি দেশির মেলবন্ধন সামান্য প্রতিভাব লক্ষণ নয়। মুখ্যভাষা রচনায সেই প্রতিভার আবশ্যক। সেই প্রতিভা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীতে অসামান্য রকম ছিল।" ('বাংলার লেখক', পৃ ৫৬-৫৭)।

হরপ্রসাদের এই ভাষা পড়েই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, "তাঁর রচনায় খাঁটি বাংলা যেমন স্বচ্ছ ও সরল এমন তো আর কোথাও দেখা যায় না।"

এই ভাষার চর্চা বাংলা সাহিত্যে বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। অবনীন্দ্রনাথের হাতে এই ভাষার ঐশ্বর্য একবার ঝিক্‌মিকিয়ে উঠেছিল, কিন্তু তিনিও 'রংছুট ময়ূরীর খেলা' দেখাতে অন্যলোকে চলে গিয়েছেন। তাই আজ হরপ্রসাদের বাক্‌স্পন্দী ভাষা চর্চার অভাবে মলিন হয়ে পড়ে আছে। সাম্প্রতিক লেখকরা কি এই ভাষার ঐশ্বর্যকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন না ?

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : যুক্তিবাহী গদ্য ও ভাববাহী গদ্য। এ দুয়ের মিলন ঘটলে যে গদ্যরীতির সৃষ্টি হয়, তা-ই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১৮৬৪-১৯১৯) গদ্যরীতি। দুরূহ বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনায় রামেন্দ্রসুন্দর যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তাঁর বিশুদ্ধ সাহিত্যালোচনাতেও অনুরূপ নৈপুণ্য লক্ষ্য করা যায়। রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যসাধনা মূলত বিশ শতকে পড়ে। প্রধান গ্রন্থগুলি হল : 'প্রকৃতি' (১৮৯৬), 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪), 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৯০৬), 'কর্মকথা' (১৯১৩), 'চরিতকথা' (১৯১৩), 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' (১৯১৪), 'শব্দকথা' (১৯১৭), এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'বিচিত্রজগৎ' (১৯২০), 'যজ্ঞকথা'(১৯১৩), 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' (১৯১৪), 'জগৎকথা' (১৯২৬)। রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত গুরু, জটিল এবং দুরূহ। স্বভাবতই এই গুরু বিষয়ের আলোচনা দুরূহ হতে পারত। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতিতে দুরূহতা, অস্বাচ্ছন্দ্য ও আড়ষ্টতার কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। এই অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীল ভঙ্গির আলোচনা বক্তব্য-বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের পূর্ণ অধিকারই শুধু প্রমাণ করে না, ভাষারীতির উপর দখলও প্রমাণ করে।

গদ্যরীতি সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর বিশেষ কোনো আলোচনা করেন নি। 'শব্দকথা' গ্রন্থে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব, ধ্বনি-বিচারমূলক আলোচনা আছে ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে। গদ্যের স্টাইল সম্পর্কে স্পষ্ট করে তিনি কোথাও কিছু বলেন নি। অথচ সাধু গদ্যরীতি ও চলিত গদ্যরীতিতে তাঁর তুল্য অধিকার ছিল।

গদ্যরীতি সম্পর্কে তাঁর একটি মাত্র অভিমত পাওয়া যায়। বিপিনবিহারী গুপ্তের 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' গ্রন্থ থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'য় এই অভিমতটি তুলে দিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দর সেখানে বলেছেন : "প্রথম প্রথম কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষা আমাকে একেবারে অভিভূত করে

ফেলেছিল; তাঁর মত গম্‌গমে ভাষায় না লিখলে মনের ভাব ভালো করে প্রকাশ করা যায় না, এই ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল; সেই মোহপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। ক্রমশ দেখলাম যে, আমি যে-সব কথা বলতে চাই, তা ও-ভাষায় চলবে না; আমার মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্যে উপযুক্ত ভাষা গড়ে তুলতে হল।”

রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতি (স্টাইল) যে তাঁরই নিজস্ব একথা অবশ্য-স্বীকার্য। এই গদ্যরীতিতে যুক্তিবাহী গদ্য ও ভাববাহী গদ্যের মিলন ঘটেছে। রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। তার ফল ফলেছে রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতিতে। এই গদ্যরীতিতে রবীন্দ্রনাথের অনতিলক্ষ্য প্রভাব আবিষ্কার করা খুব কঠিন নয়। তবে রামেন্দ্রসুন্দরের বিচক্ষণতার প্রমাণ এই যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের হুবহু অনুসরণ করেন নি। মহাকবির গদ্য যে সাধারণ লেখকের অনায়াত্ত, এ জ্ঞান তাঁর ছিল। তাই তিনি রবীন্দ্রোচিত উপমা ও বিশেষণ প্রয়োগে উন্মুখ হয়ে ওঠেন নি। পরন্তু একটি ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রাচীন ভারতীয় উপমা ও বিশেষণের দ্বারাই নিজ বক্তব্যকে প্রাঞ্জলরূপে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। বাগ্‌বৈভব রামেন্দ্র-গদ্যরীতিতে নেই, আছে প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ। এই গদ্যরীতিতে এমন একটি অনায়াসস্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীলতা আছে যা মুহূর্তের মধ্যেই পাঠকচিত্তকে প্রসন্ন করে তোলে। এখানে এই গদ্যরীতি সাহিত্যগুণোপেত হয়েছে। তারপর বক্রোক্তিযোগে তা সরস ও শাণিত হয়েছে; বিদ্রূপাত্মক শাণিত হাসিতে বক্তব্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম আকর্ষণ বিজ্ঞান-সাহিত্যের প্রতি। কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে (১৯১৩) বিজ্ঞান শাখার সভাপতিরূপে রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, “বাঙলা ভাষা এখনও বিজ্ঞান প্রচারের যোগ্য হইতে বিলম্ব রহিয়াছে: কিন্তু এই বিলম্ব ক্রমেই অসহ্য হইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

মাতৃভাষাকে এতদর্থে সুগঠিত করিয়া লইবার জন্য যে যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক, আপনাদিগকেই তাহা করিতে হইবে। সম্মিলনের বিজ্ঞানশাখা যদি বঙ্গভাষার এই অঙ্গের পুষ্টিসাধনে সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব নিরর্থক হইবে না। আমাদের বাংলা ভাষা বর্তমান অবস্থায় যতই দরিদ্র এবং অপুষ্ট হউক, উহা দ্বারা বিজ্ঞান-বিদ্যার প্রচার যে একেবারে অসাধ্য, তাহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি।"

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানালোচনার এই আগ্রহের ফল রামেন্দ্রসুন্দর, জগদীশচন্দ্র বসু ও জগদানন্দ রায়ের বিজ্ঞান-আলোচনা-গ্রন্থাদি। দর্শনালোচনাতেও রামেন্দ্র-সুন্দর অনুরূপ আগ্রহ ও কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনিও উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং তাঁর 'ঠাকুরাণীর কথা'র ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ভাষায় বলতে পারি, "দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা—মানবচিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্দ্রসঙ্গমে যুক্তবেণীতে পরিণত হইয়াছিল।" ('সাহিত্য', আশ্বিন, ১৩২৬ সাল)।

এইবার রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরচনার কিছু উদাহরণ দিই।

দুরূহ বিজ্ঞানালোচনায় তিনি গোড়াতেই একটা ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করেন। 'পৃথিবীর বয়স' নিরূপণ করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন ঃ

"জননী বসুন্ধরার বয়স নিরূপণ করিতে গিয়া মোটের উপর আন্দাজে নির্ভর করিতে হয়। কেন না জননী ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তাঁহার পুত্রকন্যার মধ্যে কাহারও উপস্থিতির সম্ভাবনা ছিল না, সেইজন্য জন্মকালনির্ণয়োপযোগী কোষ্ঠীর একান্ত অভাব। তথাপি যে জন্মকাল নির্ধারণ একেবারে অসম্ভব, তাহা স্বীকার করিয়া আপন অক্ষমতা প্রদর্শনে বড়ই লজ্জা বোধ হয়। পক্ককেশের প্রাচুর্য ও লোলচর্মের পরিমাণের সহিত ভগ্নাবশিষ্ট দন্তের সংখ্যা মিলাইলে অতিবড় প্রাচীনেরও বয়ঃক্রম অনেক সময় নির্ণীত হইয়া থাকে। অতএব এই প্রচলিত সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করিয়া প্রাচীনা জননীর বয়স নিরূপণ করিতে গেলে নিতান্ত বাতুলতা না হইতে পারে।" ('প্রকৃতি' ঃ ১৮৯৬)।

'এক না দুই' প্রবন্ধে জগত এক না দুই, এই প্রশ্নের মীমাংসাকল্পে জড়ের স্বরূপ আলোচনা :

"গতি ছাড়িয়া জড় নাই; জড় ছাড়িয়াও গতি নাই। জড়কে আশ্রয় করিয়াই গতি। কিন্তু আমাদের সম্বন্ধ মুখ্যত গতির সহিত, গৌণত জড়ের সহিত। যদি একটা জড়জগৎ মানিতে হয়, তবে একটা গতিজগৎ মানিব না কেন?

"জড়ের সহিত গতির নিত্য সম্বন্ধ। যাহা জড় তাহাই গতিশীল, অথবা যাহা গতিশীল, তাহাই জড়, এইরূপ নির্দেশ করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।

"জড়ের সহিত গতি এই সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া জড়ের একটা লক্ষণ পাওয়া যায়। জড় কি? না, যাহা গতিশীল। গতি কি? না, স্থান-পরিবর্তন। অমুক দ্রব্য গতিশীল অর্থাৎ কিনা, উহা এইক্ষণে এখানে ছিল, পরক্ষণে ওখানে গেল। এই এইক্ষণে আর পরক্ষণে, এখানে আর ওখানে, ইহার মধ্যে দুইটা পরিবর্তনের উল্লেখ দেখা যায়। একটা পরিবর্তনকে আমরা কালগত পরিবর্ত্তন বলিয়া থাকি, আর একটাকে দেশগত পরিবর্ত্তন বলিয়া থাকি। কাল ব্যাপিয়া দেশগত যে পরিবর্তন, তাহারই নাম গতি। আমরা জড়দ্রব্য অনুভব কবি না, আমরা উহার গতির অনুভব করিয়া থাকি।" (জিজ্ঞাসা : ১৯০৪)।

দুরূহ তত্ত্বকে প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার অপূর্ব ক্ষমতার পরিচয় এখানে পাই। সাধু গদ্যরীতির উদাত্ত প্রয়োগে রামেন্দ্রসুন্দর তুল্যরূপে দক্ষ ছিলেন; কিন্তু সেখানেও তিনি সতর্ক, কালীপ্রসন্ন ঘোষের শব্দাড়ম্বর তিনি সযত্নে পরিহার করেছেন। তার পরিচয়স্বরূপ কাশিমবাজারে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে (১৯০৭) রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষণের অংশ-বিশেষ এখানে তুলে দিচ্ছি :

"বসুমতীর বড়বাজারের প্রদর্শনীতে বাঙ্গালীর পক্ষে আর কোন পণ্যদ্রব্য দেখাইবার আছে কি?...জাতির সহিত জাতির ও রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের জীবনদ্বন্দ্বের বিকট কোলাহল, যাহা শত শতাব্দের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া আজ পর্যন্ত মানবের ইতিহাসে ধ্বনিত হইতেছে, সেই কোলাহলের মধ্যে বাঙ্গালীর ক্ষীণ কণ্ঠ শ্রুতিগোচর হয় না বলিলেই চলে। বাঙ্গালীর ভবিষ্যতের আশা ও

ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা যাহাই হউক, বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসে বাঙ্গালীর বৈশ্যবৃত্তির ও বীরবৃত্তির কীর্তিকথা লইয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত হইতে কখনই সাহসী হইব না। নাই বা হইলাম! তজ্জন্য লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইবার হেতু দেখি না। বাঙ্গলার পুরুষপরম্পরাগত সহস্র বৎসরের ধারাবাহিক সাহিত্য রহিয়াছে। সেই সাহিত্য লইয়া আমরা ভবের হাটে উপস্থিত হইব; সেখানে কেহ আমাদিগকে ধিক্কার দিতে পারিবে না।"

সাধু বাংলার চর্চাতেই রামেন্দ্রসুন্দর ক্ষান্ত হন নি। তিনি চলিত বাংলার চর্চাও করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতির সকল বৈশিষ্ট্যই এই চলিত গদ্যরীতিতে বর্তমান। তাঁর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' নামক অনবদ্য রচনাটির সঙ্গে বাঙালীমাত্রেরই পরিচয় আছে। প্রবল দেশানুরাগের পরিচয় হিশাবে এটি মহামূল্য রচনা। আবার চলতি বাংলা গদ্য যে কত সাবলীল ও শক্তিশালা, গম্ভীর ও উন্নত হতে পারে, তার প্রমাণস্বরূপ এটিকে দাখিল করা যায়। এই রচনা থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধার করে এই আলোচনা শেষ করি:

"বন্দে মাতরম্। বাঙলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ-কাশী পার হয়ে মা পূর্ববাহিনী হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে মা সেখানে শতমুখী হলেন। শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলাদেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গোরু, গালভরা হাসি হল। লোকে পরম সুখে বাস করতে লাগল।..."

"লক্ষ্মী দেখলেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী, আর আমার নিতান্তই বাঙলায় থাকা চলল না। আমার হিঁদু যেমন, মোছলমান তেমনি। হিঁদু-

মোছলমান যখন ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হল, তখন আর আমার বাঙালায় থাকা চলল না।”

“বাঙলার মেয়েরা ঐ দিন [তিরিশে আশ্বিন] বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত নিলে। ঘরে ঘরে সে দিন উনুন জ্বলল না। হিঁদু মোছলমান ভাই ভাই কোলাকুলি করলে। হাতে হাতে হলুদে স্থতোর রাখী বাঁধলে। ঘট পেতে বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনলে। যে এই বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শোনে, তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হন।”

রামেন্দ্রসুন্দরের এই অনবদ্য মাতৃবন্দনা চলিত গদ্যরীতির সুন্দর পরিচয়। সাম্প্রতিক কথাকারবৃন্দ যদি রামেন্দ্রসুন্দরের এই গদ্যরীতি গ্রহণ করেন, তবে তাঁরা বাংলাগদ্যের উপকার করতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

বলেন্দ্রনাথ

উনিশ শতকে যাঁরা বাংলা গদ্যের সযত্ন চর্চা করেছেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯) তাঁদের অন্যতম। তিনি ভাষার অনুশীলনে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। উনত্রিশ বছরের স্বল্পস্থায়ী জীবনে বলেন্দ্রনাথ যে গদ্যকীর্তি রেখে গেছেন, তা ভাষানৈপুণ্যে অতুলনীয়। এখানে বলেন্দ্র-প্রবন্ধাবলীর মূল্য নিরূপণ করছি না, ভাষাশিল্পী বলেন্দ্রনাথই আমার আলোচ্য।

বলেন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রথম কথা হল, তিনি আজন্ম রচনা রসিক (stylist)। ৺প্রিয়নাথ সেন এর পেছনে একটি বিশেষত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। বলেন্দ্রনাথের "কিছু মূলধন ছিল", তাই তিনি সর্বাতিশয়ী রবীন্দ্র-প্রভাবের মধ্যে থেকেও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছিলেন।

বলেন্দ্রনাথের বর্ণনায় আমরা লক্ষ্য করি তার প্রাচুর্য, তার সূক্ষ্মতা, তার চারুতা, তার নাটকীয়তা। আর এই বর্ণনার পিছনে আছে তাঁর অতন্দ্র শিল্পচেতনা।

গদ্যশিল্পী হবার সব কটি গুণই বলেন্দ্রনাথের ছিল। রবীন্দ্র পরিবেশ থেকে তিনি পেয়েছিলেন সৌন্দর্যজ্ঞান ও সুরুচি, আর নিজ সাধনায় অর্জন করেছিলেন ভাষার ওপর দখল ও ভাবের প্রতি নিষ্ঠা। এই দুয়ের সম্মিলনে আমরা পেয়েছি গদ্যশিল্পী বলেন্দ্রনাথকে। তিনি ভাষাচর্চাকে একরকম আর্টের চর্চা বলেই মনে করতেন, যার পেছনে ছিল সযত্ন অনুশীলন। রবীন্দ্র-গদ্যে দেখি বিশেষণের বহুল প্রয়োগ, আর বলেন্দ্রনাথের গদ্যে পাই বিশেষ্যপদের বহুল প্রয়োগ।

বলেন্দ্রনাথ ভাব ও ভাষার নিষ্ঠাবান শিল্পী। বলেন্দ্রনাথের গদ্য কেবল সরস নয়, তা কোমল, কেবল সমঞ্জস নয়, তা সংযমে বাঁধা। শব্দ চয়নে অসাধারণ নৈপুণ্য ও বাক্য রচনায় সযত্ন নিরীক্ষা বলেন্দ্র-রচনায় পাই। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর এই গুণগুলি লক্ষ্য করেই বলেছিলেন, "লেখকের ভাবুকতা ও লিপিকৌশল উভয়ের মূলস্থ শক্তি সামঞ্জস্যবোধ ও সংযম। এই দুইটি না থাকিলে সুরুচি থাকে না।...বলেন্দ্রনাথের যে এই সংযম প্রচুর পরিমাণে ছিল, তাহা তাঁহার

ভাষাতেও যেমন বুঝা যায়, ভাবগ্রাহিতাতেও তেমনি বুঝা যায়। তিনি ভাবের রাজ্যে বিচরণ করিতেন ও ভাবের বায়ুভরে উড়িয়া বেড়াইতেন; অথচ আপনাকে একান্ত পরবশ করিয়া মেরুদণ্ডহীনের মত ভাবের স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া আপনাকে শোচনীয় ও কৃপাপাত্র করিয়া তুলেন নাই।"

বলেন্দ্রনাথের গদ্যে যে সংযম ও কোমলতা, স্নিগ্ধতা ও শান্তি লক্ষ্য করা যায়, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বলেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডলে সে গুণগুলির প্রতিফলন দেখেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, "তাঁহাকে মিতভাষী ও মিষ্টভাষী দেখিতাম। তাঁহার রচনায় যে কোমল, স্নিগ্ধ, প্রশান্ত শ্রী ছিল, তাঁহার মুখে চোখে ও কথাবার্ত্তায় তাহা আরও স্পষ্ট দেখা যাইত। এখানে যেন তাহা সমস্ত তারল্য ও চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া আরও ঘনাইয়া আসিয়াছিল। বালকের মূর্ত্তির ভিতরে প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য্য দেখিতে পাইতাম। তাঁহার পরিমিত স্বল্পাকর উক্তি প্রত্যুক্তির ভিতর যেন একটা নির্লিপ্ততার ভাব দেখিতাম। তিনি যেন পর্য্যবেক্ষক মাত্র, সংশয়ের চক্রে তাঁহাকে যেন কেহ বাঁধিয়া দিয়াছে, কিন্তু তিনি তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন মাত্র, উহাতে আগ্রহের সহিত যোগ দিতেছেন মাত্র।" (বলেন্দ্র-রচনাবলীর ভূমিকা)।

বলেন্দ্র-চরিত্রের এই বিশ্লেষণেই নিহিত আছে বলেন্দ্র-স্টাইলের ব্যাখ্যা। বস্তুতঃ, 'style is the man' এই কথাটি বলেন্দ্র-জীবনে সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে।

বলেন্দ্রনাথের গদ্যের আরো লক্ষণীয় গুণ হল—গঠন-সৌষ্ঠবের নৈপুণ্য, কারুশিল্পীর নিষ্ঠা, ডীটেলের (detail) প্রতি ঝোঁক, নাটকীয়তা সৃষ্টির কৌশল, প্রৌঢ়ের দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টি, সৌম্য বিচারবুদ্ধি। এইসব গুণের সমবায়ে গঠিত হয়েছে বলেন্দ্রনাথের স্টাইল। সুতরাং বলেন্দ্রনাথকে বাংলা গদ্যের প্রথম শ্রেণীর শিল্পী (artist) বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই। বলেন্দ্রনাথের গদ্যে যে অনায়াসনৈপুণ্য, যে স্বাচ্ছন্দ্য, যে সংযম, যে প্রশান্তি লক্ষ্য করা যায়, তা যে বহু প্রযত্নের ফল মাত্র, একথা আমরা ভুলে যাই। বলেন্দ্রনাথ আজন্ম গদ্য সাধনা করেছেন, তার পরিপূর্ণ-রূপটি আমরা দেখেছি, ফলে তাঁর দুরূহ সাধনার দিকটি

চোখে পড়ে না। এই সাধনাব উল্লেখ করে আচার্য বামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, "আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাষাব প্রতি এইরূপ যত্ন অতি দুর্লভ; অধিকাংশ লেখক ভাষাকে কেবল ভাব-প্রকাশের যন্ত্রমাত্র দেখেন, উহাকে কারুশিল্পের হিসাবে দেখেন না। কবিতা রচনায় ছন্দের আবশ্যকতা আছে; বলেন্দ্রের গদ্য রচনাতেও সেই ছন্দের ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়; এই ছন্দ ভাবের সহিত মিলিযা মিশিয়া অপরূপ কলাকৌশলের উৎপত্তি করিয়াছে।" বলেন্দ্র-গদ্যের সঙ্গে পূর্ণ স্রোতস্বতীর তুলনা চলে; স্রোতস্বতীর মতই এই গদ্য স্থির মন্থর গতিতে আপন নির্দিষ্টে চলে; এব গতিপথে কখনো ফেনিল আবর্ত উপস্থিত হয় না; উত্তাল তরঙ্গের কোলাহল কখনো এর ধ্যান ভঙ্গ করেনি; উপলব্ধির পথে এর শান্তগতি কখনো ব্যাহত হয নি; বলেন্দ্র-গদ্য-প্রবাহে তাই কেবল শান্তি, কেবল কোমলতা, কেবল প্রসন্নতা, কেবল উজ্জ্বলতা; আর এই প্রবাহের নিযামক অতন্দ্র শিল্পসাধক গদ্যশিল্পী বলেন্দ্রনাথ। বলেন্দ্রনাথের অতিযত্নে গড়ে তোলা স্টাইলেব পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে 'প্রাচীন উড়িষ্যা', 'দিল্লীর চিত্রশালিকা', 'কণাবক' প্রমুখ প্রবন্ধে। বলেন্দ্রনাথের হাতে ভাষার এক বীণাযন্ত্র ছিল, সে বীণাযন্ত্রে কখনো গম্ভীর, কখনো মধুর, কখনো উদাত্ত, কখনো স্তিমিত, কখনো ব্যাহত, কখনো লাস্যচঞ্চল ধ্বনি বেজে উঠেছে।

'প্রাচীন উড়িষ্যা' প্রবন্ধেব কয়েকটি ছত্র এখানে তুলে দিচ্ছি—এ থেকেই বলেন্দ্র-গদ্যের ধ্বনিরোল শোনা যাবে: "জীবনস্রোত ভাবতবর্ষে তখনও মন্দীভূত হইয়া আসে নাই। জীবনে সুখও ছিল, সখও ছিল—সুরম্য হর্ম্যমধ্যে সুসজ্জিত কক্ষে প্রমদাগণ দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বসিয়া প্রিয়জনের সহিত সুখে প্রেমালাপ করিতেন; অনতি উচ্চ মঞ্চোপরি সরক ও পানপাত্র থাকিত, এবং সুন্দরীর পাণ্ডু কপোলদেশ বারুণীরাগসঞ্চারে অরুণিম শোভা ধারণ করিত। কলাবিদ্যার তখন বিশেষ প্রাদুর্ভাব। বীণার তারে তারে নাচিয়া নাচিয়া তম্বঙ্গীর চম্পক অঙ্গুলি সৌদামিনীর মত খেলিয়া বেড়াইত এবং প্রিয়জন সেই চঞ্চল অঙ্গুলি চালনার মধ্যে পথ খুঁজিয়া পাইতেন না। কেবল, সেই মধুর বীণাধ্বনি,

সুন্দরীর অঙ্গরাগসৌরভ ও চঞ্চল রূপের তরঙ্গ মিলিয়া মলয়সেবিত চন্দ্রালোকস্নিগ্ধ নিশাকে স্বপ্নের মত মনোহর করিয়া তুলিত।"

কেবল দূর-অতীত বিলাস উৎসবের বর্ণনা নয়, জনতার উৎসবের বর্ণনাও আছে; সেখানে বলেন্দ্রনাথ রঙের পর রঙ চড়িয়ে বর্ণভাণ্ড নিঃশেষ করে ফেলেছেন। এই প্রবন্ধেরই অপর বর্ণনাঃ "এমনি দেখিতে দেখিতে ধান কাটার দিন আসিত। সোনার ধানে ক্ষেত ভরিয়া উঠিয়াছে। কৃষকেরা দলে দলে ধান কাটিতে বাহির হইয়াছে; কৃষকাঙ্গনারা গান গাহিতে গাহিতে ধানের আঁটি বাঁধিতেছে। গৃহে গৃহে উৎসব। দেবতা মন্দিরে পূজার ভারি ধূম। সিংহাসন হইতে রাজা নামিয়া আসিয়াছেন, প্রাসাদ হইতে অমাত্যের দল উপস্থিত, পশ্চাতে সমস্ত প্রজাপুঞ্জ; মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে বাহিরের দিগন্ত অবধি লোকারণ্য। উজ্জ্বল নীলাকাশতলে বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণের বেশভূষা —ময়ূরবর্হি ধূপছায়া লাল নীল সোনালী গোলাপী বেগুণী নানা বর্ণের তরঙ্গ; মণিমুক্তা জরী জহরৎ ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। পট্টবস্ত্র পরিহিত ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপাঠ করিতেছেন, হোমাগ্নিতে অনবরত ঘৃতাহুতি ও লাজাঞ্জলি প্রদত্ত হইতেছে, স্তূপাকার পুষ্পরাশিতে দেবতা দুর্নিরীক্ষ্য; বাহিরে নহবৎ বসিয়াছে, ভিতরে কাঁসরঘণ্টা শঙ্খধ্বনির বিরাম নাই; আবালবৃদ্ধবনিতা রাজা হইতে ভিক্ষুক অবধি নতশিরে দেবতার আশীষ গ্রহণ করিতেছেন।"

'দিল্লীর চিত্রশালিকা' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের স্টাইলের চরম পরীক্ষা হয়েছে। শুদ্ধমাত্র বিশেষণ প্রয়োগে জীবন্ত বর্ণনায় কোনো চিত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার দুর্লভ ক্ষমতা বলেন্দ্রনাথের ছিল। প্রখ্যাত ফরাসি পর্যটক পিয়ের লোতির 'ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্তে' এই দুর্লভ ক্ষমতার পরিচয় পাই। অন্ততঃ এই বিষয়ে বলেন্দ্রনাথ পিয়ের লোতির সমকক্ষ। বর্ণনার সূচনা এইরূপঃ "প্রাচ্য জীবনপ্রবাহেরই মত এই চিত্রার্পিত জীবনস্রোত রূপে বর্ণে আলোকে, বিচিত্র মিলন বিরহ সম্ভোগে, কখনও হাসিতে, কখনও অশ্রুচ্ছ্বাসে, কখনও সুখে, কখনও বেদনায়, কোথাও নিবিড় নির্জন দাম্পত্যের রমণীয় স্নিগ্ধচ্ছায়ে, অন্যত্র আলোকচ্ছটা-বিচ্ছুরিত সহস্রসখীপরিরম্ভাকুলিত নৃত্যগীতরস-রভসে হিল্লোলিত ও বিহ্বলিত হইয়া মদালসময়ী মন্দগতিতে নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে।"

এই বর্ণনাগুলি পড়লে মনে হয় যেন ভাষায় মৃদঙ্গ বাজছে—কখনো তা মধুর, কখনো গম্ভীর, কখনো চটুল, কখনো বা বিষণ্ণ। আর এই মৃদঙ্গধ্বনির স্রষ্টা বলেন্দ্রনাথ।

'দিল্লীর চিত্রশালিকা' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের স্টাইলের চরম পরীক্ষা হয়েছে, আর 'কণারক' প্রবন্ধে চরম বিকাশ। এই প্রবন্ধে ভাষাশিল্পী বলেন্দ্রনাথের যে পূর্ণ পরিচয় পাই তা আর কোথাও পাই না। এই প্রবন্ধের পিছনে একটি উদাস বিধুর বিদগ্ধ ও অতন্দ্র শিল্পবোধসম্পন্ন মানুষের পরিচয় পাই। সে মানুষ বলেন্দ্রনাথ। পরিত্যক্ত নির্জন অবহেলিত সূর্যমন্দিরের প্রাচীন বৈভব ও বর্তমান রিক্ততা বলেন্দ্রনাথ নিপুণতারে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে বর্ণভাণ্ডের রঙ নিঃশেষিত হয়নি, হৃদয়ের সমবেদনা বলেন্দ্রনাথ উজাড় করে দিয়েছেন। কণারকের বর্তমান উদাস-বিধুর রূপটি দীর্ঘায়ত বাক্যের বাঁধনে ধরা পড়েছে। এর বর্ণনায় নিরুচ্ছাস বিবৃতি ও অনলংকৃত উপমার পিছনে কাজ করেছে একটি সচেতন শিল্পীমন। সূচনাটি এইরকম: "কণারকে এখন কিছুই নাই, ধূ ধূ প্রান্তর মধ্যে শুধু একটি অতীতের সমাধিমন্দির—শৈবালাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন বক্ষের মধ্যে পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী।" তারপর অতীত বৈভবের পর্যালোচনা: "এই বিলাসখচিত মন্দিরের দ্বারে কত লোকে কতদিন অন্তরের দারুণ নির্বেদ লইয়া আসিয়াছে। সংসার পাছে কামনার উদ্রেক করে, পাছে কোনদিন স্ত্রীর মুখ দেখিয়া মোহ উপস্থিত হয়, সন্তানের মায়া কাটান না যায়, বৃদ্ধ পিতামাতার অশ্রুজল বন্ধনচ্ছেদনে বাধা দেয়, গৃহ স্ত্রী পুত্র পিতামাতা সমস্ত পরিজন পরিত্যাগ করিয়া লোকে দেবদ্বারে আসিয়া হত্যা দিয়া পড়িয়াছে—হে দেবতা, রক্ষা কর, মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া দাও, আমি তোমার দ্বারে চিরদিন সন্ন্যাসী হইয়া রহিব। হায়, জড় দেবতা, সে যদি বুঝিত—তুমি কি অন্ধকার মোহরাশিতে গঠিত! ক্ষীণ দীপালোকে তুমি ভক্ত হৃদয়ের বৈরাগ্য অনুমোদন কর; এবং শত দীপালোকে তোমারই সম্মুখ-প্রাঙ্গণে নিত্য মদন বিলাসের এক অঙ্ক অভিনীত হয়!" তারপর

'কণারকে'র বর্তমান রিক্তরূপের আশ্চর্য বর্ণনা ঃ "কণারকে এখন দেবতা নাই—এত কথা বলা খাটে না। কিন্তু সমস্ত প্রান্তর জুড়িয়া সেখানে এক নিশ্চল বৈরাগ্য বাসা বাঁধিয়াছে। তাহার মুখে কেবল হায় হায়।......পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপের নির্জন নিকেতনে নিশাচর বাদুড় বাসা বাঁধিয়াছে, হিমশিলাখণ্ডোপরি বিষধর ফণিনী কুণ্ডলী পাকাইয়া নিঃশঙ্ক বিশ্রামসুখে লীন হইয়া আছে; সম্মুখের ঝিল্লিমুখরিত প্রান্তরদেশ দিয়া গ্রাম্য পথিকজন যখন কদাচিৎ দূর তীর্থ উদ্দেশে যাত্রা করে, একবার এই জীর্ণ দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে চাহিয়া দেখে এবং বিলম্ব না করিয়া আসন্ন সূর্যাস্তের পূর্বেই দ্রুতপদে আবার পথ চলিতে থাকে।—কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত; যেন কোন প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবালশয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে—এবং অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষীণপাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মত বোধ হয়।" কণারকের অধঃপতনে দুঃখিত লেখক 'স্বপ্নো নু, মায়া নু, মতিভ্রমো নু' বলে বিলাপ করেছেন মৃদুকণ্ঠে, আর এই বিলাপ গদ্যরাজ্য উত্তীর্ণ হয়ে গীতিকাব্যের রাজ্যে পৌঁছেছে। এখানেই বলেন্দ্রনাথের স্টাইলের চরম প্রকাশ। শেষ কথা, বলেন্দ্রনাথ গদ্যলেখক নন, গদ্যশিল্পী। এই শিল্প ক্ষমতা তিনি অর্জন করেছেন, ভাষার সচেতন অনুশীলনে গদ্যের জাদুমন্ত্রটি আয়ত্ত করেছেন। বাংলা সাধু গদ্য নিপুণ শিল্পীর হাঁতে পড়লে কত গভীর ও অর্থবহ, স্বচ্ছন্দ ও প্রশান্ত, কোমল ও উজ্জ্বল হয়, তার প্রমাণ বলেন্দ্রনাথের গদ্য। বলেন্দ্রনাথ কেবল নিপুণ ভাষাশিল্পী নন, তিনি নিষ্ঠাবান্ শিল্পী। বোধকরি এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা।

অবনীন্দ্রনাথ

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি যে বড় সাহিত্যিক ছিলেন, সে সম্বন্ধে ইদানীং কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু গদ্যশিল্পী হিশেবেও যে তাঁর একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে, তা আমরা উপেক্ষা করেছি। বস্তুতঃ বাংলা গদ্যের জাত-শিল্পী অভিধায় যে স্বল্প কয়েকজনকে ভূষিত করা যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) তাঁদের অন্যতম। তার চিত্রসাধনার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যসাধনার ধারা প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে। 'শকুন্তলা' (১৮৯৫) গ্রন্থে যে সাধনার সূচনা, 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (১৯৪৪) গ্রন্থে তার পরিণতি। এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে অবনীন্দ্রনাথ যে অনুপম বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন, তাতে বরাবর একটি বিশিষ্ট স্টাইল ব্যবহার করেছেন। এই গদ্য-রীতিকে এক কথায় বলা যায়, অবনীন্দ্র-স্টাইল। এই স্টাইলে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। কিন্তু এই প্রভাব অবনীন্দ্র-বৈশিষ্ট্যকে লুপ্ত করে দেয় নি। 'শকুন্তলা', 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'ভারতশিল্প', 'ভূতপতরীর দেশ' 'নালক,' 'পথে বিপথে', 'বাংলার ব্রত,' 'খাজাঞ্চীর খাতা', 'বুড়ো আংলা', 'আপন কথা', 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে'—পঞ্চাশ বছরের সাহিত্য-সাধনার এই ফল অবনীন্দ্রনাথ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এতে বিষয়-বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু একই স্টাইল তিনি সারাজীবন অনুসরণ করেছেন। বাংলা গদ্যের সেই স্টাইলকেই বলি অবনীন্দ্র-স্টাইল।

অবনীন্দ্র-গদ্যস্টাইলের স্বরূপ কী? তাকে এক কথায় বলতে পারি, রূপ-কথার স্টাইল। রূপকথার অন্তরে যে সুর বিধৃত, তা গানের সুর, শৈশব-রোমান্স তার ভাবাবহ, অসম্ভবের রাজ্যে তার অভিযান। রূপকথার বর্ণনায় যে মোহ, যে জাদু, যে স্বপ্ন, যে আবেশ আছে, তা অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যে চালান করে দিয়েছেন। এ যে কি দুরূহ কাজ, তা বলে বোঝানো যায় না। রূপকথার বর্ণনা গীতিপ্রধান, তার ভাষা গীতিস্পন্দী, তার শব্দনিচয় স্বপ্নমাখানো। গদ্যের কোমল সরস স্বপ্ন-মাখানো রূপটি আমরা পাই রূপকথার বর্ণনায়। এ ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয়-রহিত। বাংলা গদ্যে তিনি যে ঐশ্বর্য এনে দিয়াছেন, তার তুলনা হয় না।

অবনীন্দ্রনাথ যে বিষয়ে লিখুন না কেন, তাতে রূপকথার স্টাইলটি, গানের সুরটি, শৈশবের স্বপ্ন-মাখানো গুঞ্জরণটি অনুস্যূত হয়ে আছে। শিশুপাঠ্য 'নালক' 'ক্ষীরের পুতুল' বা কিশোরপাঠ্য 'রাজকাহিনী', 'বুড়ো আংলা' হোক, আর বয়স্কপাঠ্য 'ঘরোয়া', 'জোড়াসাঁকোর ধারে' কিংবা 'ভারতশিল্প', 'বাগেশ্বরী-শিল্পপ্রবন্ধাবলী'-জাতের গুরু তত্ত্বালোচনাই হোক, সর্বত্রই অবনীন্দ্রনাথ এই রূপ-কথা-স্টাইলটি বজায় রেখেছেন।

তাঁর স্টাইলে ধরা পড়েছে বহুযুগের মায়ের কোলের ঘুমপাড়ানী গান আর শৈশব-সন্ধ্যায় কম্পমান প্রদীপ-আলোয় মাতামহী-পিতামহীর স্নেহক্ষরা সুধামাখা কণ্ঠের সুর। রূপকথা-কথন কঠিন, ততোধিক রূপকথা-লিখন! রূপকথার গদ্যে স্থূলতার স্পর্শ নেই, রোমান্সের স্পর্শ আছে। লিখিত গদ্যে এই সৌকুমার্য বজায় রাখতে যে দুরূহ নৈপুণ্যের প্রয়োজন, তা অবনীন্দ্রনাথেব ছিল। মৌখিক-ভাষাকে লেখ্য-ভাষায় পরিণত করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ যে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন তা বাংলা গদ্যে আর কেউ কখনও করেন নি। এইজন্যই অবনীন্দ্র-স্টাইলকে বহুমান্যতা দান করা উচিত।

অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির সূচনা 'শকুন্তলা' ও 'ক্ষীরের পুতুলে', পরিণত প্রকাশ 'রাজকাহিনী', 'নালক', 'পথে বিপথে' গ্রন্থে এবং চরম পরিণতি 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থে।

অবনীন্দ্র-স্টাইলের অপর বিশেষত্ব হচ্ছে—তা সর্বজন-বোধ্য। এই গদ্য সবাইকে মুগ্ধ করে—শিশু, কিশোর, বয়স্ক, বৃদ্ধ সবাই এর সুরে তৃপ্ত হয়। একাধারে সর্বজনপ্রিয় হবার গুণ অবনীন্দ্র-গদ্যের আছে। অর্থাৎ গদ্যের সাধারণ বন্ধন ও সংস্কার কাটিয়ে উঠে অবনীন্দ্রনাথ যে গদ্যের সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে নিত্যকালের স্পর্শ লেগেছে।

'শকুন্তলা,' 'ক্ষীরের পুতুল', 'নালক,' 'বুড়ো আংলা'—এই বইগুলির কাহিনীই রূপকথাধর্মী। সুতরাং তাতে রূপকথা-স্টাইলের প্রয়োগ সহজ হয়েছে।

শিশুপাঠ্য এই বইগুলিতে বাস্তব ও প্রবীণের দাবি অনুপস্থিত, তাই হয়তো এ কথা বলা যায় যে এ ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের সাফল্য সহজলভ্য ছিল। আর 'রাজকাহিনী'? সেখানে রাজস্থানের গল্প আর ইতিহাসের বাঁধনে আবদ্ধ নেই, তা রূপকথায় পরিণত হয়েছে অবনীন্দ্রনাথের হাতে। সুতরাং সেখানেও রূপকথার জাদু সৃষ্টি করা সহজতর ছিল। কিন্তু 'পথে বিপথে গ্রন্থে? এ তো সদ্য-ঘটিত ভ্রমণ-বর্ণনা। চাঁদপাল-ঘাটের ফেরি ষ্টীমারে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ। এই সাধারণ ঘটনাকে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর কলমের স্পর্শে অসামান্য করে তুলেছিলেন, তাই এ গ্রন্থে বাস্তব ভ্রমণ-কাহিনীর ভার নেই। "এক পা সত্যের নৌকায় আর-এক পা রূপকথার নৌকায়" রেখে চলার দুরূহ নৈপুণ্য এখানে অবনীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এখানেই শেষ নয়। 'ভারত শিল্প' ও 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী'তে শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে যে গুরু আলোচনা রয়েছে, অবনীন্দ্রনাথ তাকে সহজবোধ্য ও অনায়াসগম্য করে তুলেছেন এবং বলার গুণে তার কাঠিন্য ও দুরূহতা দূর হয়েছে।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের সবচেয়ে কৃতিত্ব—'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র ইতিহাসকে তিনি রূপকথায় পরিণত করেছেন। এ কেমন করে সম্ভব হল? শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর অনুসরণে বলি, তিনটি কারণে। প্রথমতঃ, জোড়াসাঁকোর ইতিহাসের প্রথম অঙ্ক বাংলা দেশের একটা বিগত যুগের কথা। অবনীন্দ্রনাথ এই ব্যবধান ও দূরত্বের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, সময়ের দূরত্বের উপরে ইতিহাসের ঘটনা ঘনীভূত হয়ে চেপে বসেছে ও তাকে নূতন অর্থ ও দূরত্ব দান করেছে। তৃতীয়তঃ, লেখকের বিশেষ সাহিত্যিক গুণ। (শ্রীবিশী-রচিত 'বাংলার লেখক' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

এই তৃতীয় গুণটির উপর আমি বিশেষ জোর দিচ্ছি। এই দুই গ্রন্থে অবনীন্দ্র-স্টাইল চরমে উপনীত হয়েছে। "জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি বাংলা সাহিত্যের ক্ষুধিত পাষাণ। বাংলা দেশের প্রভাতের আশা এবং অপরাহ্ণের ম্লানিমা এখানে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিরাজমান।…নব্যবঙ্গ-সংস্কৃতির সমগ্র সুরসপ্তকের সঙ্গে পরিচিত এই প্রাসাদ। ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্বনি ও বিশ্বসংস্কৃতির প্রতিধ্বনি এখানে বসিয়া শোনা যায়" (তদেব)

রূপকথার ওস্তাদ শিল্পীর কলমের ছোঁয়ায় এই ক্ষুধিত পাষাণের সকল চরিত্র, মায় গাছপালা আসবাবপত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে, রূপকথার অলৌকিকতায় সমৃদ্ধ হয়েছে। এই দুই গ্রন্থের বর্ণনায় এমন একটা বিষণ্ণতা ও শ্রান্তি আছে, যা ঠাকুরবাড়ি ও অবনীন্দ্রনাথের জীবনাবসানের প্রশান্ত করুণতা ও যুগাবসানের ক্লান্তিকে নিঃশেষে প্রকাশ করে। "কত অভিনয় কত খেলা করে, কত সুখ-দুঃখের দিন কাটিয়ে, সেই জোড়াসাঁকোর বাড়ি মাড়োয়ারি ধনীকে বেচে বের হতে হল যেদিন আমার নিজের ছেলেপিলে বউঝি নিয়ে"—এই বর্ণনা পাঠকমনকে স্পর্শ করে, আপরাহ্নিক বিষাদের ছায়া আমাদের আচ্ছন্ন করে, হৃদয়ের সপ্ত-তন্ত্রীতে বেদনার গীতধ্বনি জেগে ওঠে, মুহূর্তের মধ্যে এই ঘটনা অসাধারণ হয়ে ওঠে, একটি যুগের অবসানে মন্থর ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়। এর মূলে রয়েছে অবনীন্দ্রনাথের ওই অনন্য বিশিষ্ট একক গদ্যরীতি—রূপকথা-স্টাইল। এখানেই গদ্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের মহিমা।

গদ্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের পরিচয়লাভের একমাত্র উপায় তাঁর রচনাপাঠ। সে দায়িত্ব পাঠকের। এই প্রবন্ধের বক্তব্য সমর্থনে এখানে কয়েকটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি, তাতেই অবনীন্দ্রনাথের জাদুর পরিচয় পাওয়া যাবে।

প্রথমেই রূপকথার প্রধান দায়িত্ব—চিত্রময় জগৎ সৃষ্টির পরিচায়ক একটি অনুচ্ছেদ—

"পুষ্পবতী যত্ন কোরে নিজের কালো চুলের চেয়ে মিহি, আগুনের চেয়ে উজ্জ্বল, একগাছি সোনার তার সরু হ'তেও সরু একটি সোনার ছুঁচে পরিয়ে একটি ফোঁড় দিয়েছেন মাত্র, আর চাঁপার কলির মত পুষ্পবতীর কচি আঙুলে সেই সোনার ছুঁচ বোলতার হুলের মত বিঁধে গেল! যন্ত্রণায় পুষ্পবতীর চোখে জল এল ও তিনি চেয়ে দেখলেন, একটি ফোঁটা রক্ত জ্যোৎস্নার মত পরিষ্কার সেই রূপোর চাদরে রাঙা এক টুকরো মণির মত ঝক ঝক্ করছে। পুষ্পবতী তাড়াতাড়ি নির্মল জলে সেই রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন, ক্রমশ ক্রমশ বড় হয়ে, একটুখানি ফুলের গন্ধ যেমন হাওয়াকে গন্ধময় করে, তেমনি পাতলা ফুরফুরে চাদরখানি রক্তময় করে ফেল্লে।" (রাজকাহিনী)

বৌদ্ধজাতক-কাহিনী অবলম্বনে লিখিত 'নালক' গ্রন্থের একটি বর্ণনা :

"সন্ধ্যাবেলা। নীল আকাশে কোনোখানে একটু মেঘের লেশ নেই, চাঁদের আলো আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত নেমে এসেছে, মাথার উপর আকাশগঙ্গা একটুকরো আলোর জালের মত উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত দেখা দিয়েছে। কেবল ঋষি গ্রামের পথ দিয়ে গেয়ে চলেছেন 'নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়' ; মায়ের কোলে ছেলে শুনছে 'নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়'; ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মা শুনছেন 'নমো নমো' ; বুড়ি দিদিমা ঘরের ভিতর থেকে শুনছেন 'নমো' ; অমনি তিনি সবাইকে ডেকে বলছেন—

ওরে নোমো কর্, নোমো কর্। গ্রামের ঠাকুরবাড়ির শাঁখ-ঘণ্টা ঋষির গানের সঙ্গে এক তানে বেজে উঠেছে—নমো নমো! রাত যখন ভোর হয়ে এসেছে, শিশিরে ধুয়ে পথ যখন বলছে নমো, চাঁদ পশ্চিমে হেলে বলছেন নমো, সমস্ত সকালের আলো পৃথিবীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যখন বলছেন নমো, সেই সময়ে ঘুম ভেঙে নালক উঠে বসেছে আর অমনি ঋষি এসে দেখা দিয়েছেন।"—এখানে সমস্ত বর্ণনাটি পবিত্র ঘণ্টাধ্বনির মত বেজে চলেছে।

বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী'তে অবনীন্দ্রনাথ শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কিত গুরু আলোচনাকে কত অবলীলায় প্রকাশ করেছেন, তার উদাহরণ ঃ

"বর্ষার মেঘ নীল পায়রার রং ধরে এল, শরতের মেঘ সাদা হাঁসের হাল্‌কা পালকের সাজে সেজে দেখা দিল, কচি পাতা সবুজ ওড়না উড়িয়ে এল বসন্তে, নীল আকাশের চাঁদ রূপের নূপুর বাজিয়ে এল জলের উপর দিয়ে ; কিন্তু এদের এই অপরূপ সাজ দেখবে বলে যে, সেই মানুষ এল নিরাভরণ নিরাবরণ, শীত তাকে পীড়া দেয়, রৌদ্র তাকে দগ্ধ করে, বাস্তব জগৎ তার উপর অত্যাচার করে বিশ্ব চরাচরে রহস্যের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচারের মধ্যে তাকে বন্দী করতে চায় :—এই মানুষ স্বপন দেখলে অগোচরের অবাস্তবের অসম্ভবের অজানার ; সেই দেখার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি বদল করে নিলে সৃষ্টির বাইরে এবং সৃষ্টির অন্তরে যে, তার সঙ্গে সেই অদ্বিতীয় শিল্পীর এই অপরাজিত প্রতিনিধি। মানুষ মনোজগতের অধিকারী, বহির্জগতের প্রভু।"

আর কাব্যধর্মী, গদ্যের পরিচয় পেতে হলে 'পথে বিপথে' বইটি পড়া দরকার।

উদ্ধৃতি দিতে হলে বিস্তৃত অংশ উদ্ধার করতে হয়, তাই বিরত হলাম। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির চরম বিকাশ হয়েছে 'ঘরোয়া', জোড়াসাঁকোর ধারে' বইদুটিতে। এখানে গদ্য কেবল ক্ষিপ্রচারী ও লঘুগতি নয়, তা যেন বাস্তব ও স্বপ্নের সীমান্তরেখার অনুবর্তী। একান্ত বস্তুগত বিবরণ এখানে রূপকথার পর্যায়ে পৌঁছেছে। 'জোড়াসাঁকের ধারে' গ্রন্থের ষোলো অধ্যায়ে গঙ্গার বর্ণনা বা উনিশ অধ্যায়ে মুসৌরিতে পাখিদের গানের বর্ণনা জাদুকরের স্পর্শে মায়াময় হয়ে উঠেছে। এর সামান্য উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করা দুঃসাধ্য।

গঙ্গার বর্ণনা ঃ "তা সেই সুরধনী গঙ্গাকে দেখেছি আমি। ছেলেবেলায় কোন্নগরের বাগানে বসে দেখতুম—দুকূল ছাপিয়ে গঙ্গা ভরে উঠেছে, কুলু কুলু ধ্বনিতে বয়ে চলেছে ; সে ধ্বনি সত্যিই শুনতে পেতুম। ঘাটের কাছে বসে আছি, কানে শুনছি তার সুর, কুল্ কুল্ ঝুপ্, কুল্ কুল্ ঝুপ্—আর চোখে দেখছি তার শোভা—সে কী শোভা, সেই ভরা গঙ্গার বুকে ভরা পালে চলেছে জেলে নৌকো, ডিঙি নৌকো। রাত্তিরবেলা সারি সারি নৌকোর নানারকম আলো পড়েছে জলে। জলের আলো ঝিলমিল করতে করতে নৌকোর আলোর সঙ্গে সঙ্গে নেচে চলত। কোন নৌকোয় নাচগান হচ্ছে, কোন নৌকোয় রান্নার কালো হাঁড়ি চেপেছে, দূর থেকে দেখা যেত আগুনের শিখা।...গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত কোন ঋতুই বাদ দিই নি, সব ঋতুতেই মা গঙ্গাকে দেখেছি। এই বর্ষাকালে দুকুল ছাপিয়ে জল উঠেছে গঙ্গার,—লাল টকটক করেছে জলের রং—তোমরা খোয়াই-ধোয়া জলের কথা বল ঠিক তেমনি, তার উপরে গোলাপী পাল তোলা ইলিশ মাছের নৌকো এদিকে ওদিকে দুলে দুলে বেড়াচ্ছে, সে কি সুন্দর! তারপর শীতকালে বসে আছি ডেকে গরম চাদর জড়িয়ে, উত্তুরে হাওয়া মুখের উপর দিয়ে কানের পাশ ঘেঁসে বয়ে চলেছে হু হু করে। সামনে ঘন কুয়াশা, তাই ভেদ করে ষ্টীমার চলেছে একটানা। সামনে কিছুই দেখা যায় না। মনে হত যেন পুরাকালের ভিতর দিয়ে নতুন যুগ চলেছে কোন রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে। থেকে থেকে হঠাৎ একটি দুটি নৌকো সেই ঘন কুয়াশার ভিতর থেকে স্বপ্নের মত বেরিয়ে আসত।" অবনীন্দ্রনাথ তাঁর জাদু-কলমের ছোঁয়ায় আমাদের ওই স্বপ্নজগতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন।

প্রমথ চৌধুরী

অনুশীলিত দেহের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহাকবি কালিদাস বলেছেন যে, সে দেহ মেদচ্ছেদকৃশোদর, প্রগুণ, প্রাণসার, উৎসাহযোগ্য ; সে দেহভার বর্জন করেছে, সার অর্জন করেছে, তা অদম্য প্রাণশক্তির আধার, সে দেহ পলিমাটির লতাপাতা খাওয়া হোঁৎকা হাতীর দেহের মত নয়, তা গিরিচর নাগের দেহের মত। কালিদাসের এই বর্ণনা অনুশীলিত মনেরও বর্ণনা। প্রমথ চৌধুরী এই মনের অধিকারী ছিলেন। রাজলেখক প্রমথ চৌধুরীর এটি নিখুঁত বর্ণনা। তিনি অতি যত্নে তাঁর মনটি তৈরি করেছিলেন, তাই তাঁর মন সমস্ত ভাব ঝেড়ে ফেলে লঘু হয়েছিল, সারবান হয়েছিল, সরস হয়েছিল। ভট্টবানের ভাষায় আমরা প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে বলতে পারি তিনি "অখিলকলাকলাপলোচন-কঠোর মতিঃ নিখিলশাস্ত্রাবগাহনগভীরবুদ্ধিঃ।"

এই লেখকের অনুশীলিত বিদগ্ধ মনের সম্পূর্ণ প্রতিফলন হয়েছে তাঁর রচনারীতিতে। বস্তুতঃ, Style is the man এই কথাটি যদি কোন বাঙালী লেখক সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা চলে, তিনি হচ্ছেন 'বীরবল' ওরফে প্রমথ চৌধুরী। বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রমথ চৌধুরীর স্থান কোথায়? আমার মনে হয় সাহিত্যিক হিসেবে নয়, সাহিত্যগোষ্ঠীর অধিনায়ক হিশেবে। সবুজপত্রের (১৯১৪) সাহিত্যিক গোষ্ঠী তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ভট্টবানের ভাষায় তাকে বলতে পারি "প্রবর্ত্তয়িতা গোষ্ঠীবন্ধানম্।"

এই প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যকৃতি নিয়ে নয়, রচনানীতি নিয়ে আলোচনা করব। সবুজপত্রের মাধ্যমে প্রমথ চৌধুরী একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্র সাহিত্য আন্দোলন প্রবর্তিত করেন এবং তার বাহক হিশেবে চলতি ভাষাকে গ্রহণ করেন। কেবল নিজে ও স্ব-গোষ্ঠীকে নয়, রবীন্দ্রনাথকেও তিনি এ পথে টেনে এনেছিলেন। অসাধারণ চিৎপ্রকর্ষ, অতুলনীয় রচনারীতি, গভীর মনীষা ও ক্ষুরধার বুদ্ধির জোরে তিনি একটি সাহিত্য আন্দোলনের প্রবর্তকরূপে বাংলা সাহিত্যসংসারে চিরখ্যাত থাকবেন।

এই চলতি ভাষার স্বপক্ষে তাঁর যুক্তি গোড়াতেই উদ্ধার করি। তিনি 'কথার কথা' প্রবন্ধে বলেছেন ঃ আমি বাংলাভাষা ভালবাসি, সংস্কৃতকে ভক্তি করি। কিন্তু এ শাস্ত্র মানিনে, যাকে শ্রদ্ধা করি, তারই শ্রাদ্ধ করতে হবে।······যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়!······ভাষার এখন শানিয়ে ধার বার করা আবশ্যক, ভার বাড়ান নয়। যে কথাটা নিতান্ত নইলে নয়, সেটি যেখান থেকে পার নিয়ে এসো, যদি নিজের ভাষার ভিতর তাকে খাপ খাওয়াতে পার। কিন্তু তার বেশী ভিক্ষে, ধার, কিম্বা চুরি করে এনো না। (বীরবলের হালখাতা)।

এই অভিমতে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, প্রমথ চৌধুরী চল্‌তি ভাষাকেই রাজটীকা দিতে চান এবং প্রয়োজন মত বাইরে থেকে শব্দ গ্রহণ করতে তাঁর আপত্তি নেই। এখন দেখা যাক প্রমথ চৌধুরী তাঁর রচনারীতিতে এই আদর্শকে কতটা সফল করতে পেরেছেন। ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনী রাজপুত্র সুন্দরকে বলেছিল,

নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে,
কথায় তাহারা সব মনের গাঁট কাটে।

মনের গাঁট কাটার এই বিদ্যায় প্রমথ চৌধুরী ওস্তাদ নাগরিক ছিলেন। তার রচনারীতিই এই সাফল্যের মূল। অন্নদাশংকর রায়ের কথায় বল্‌তে পারি, "পাকা রাঁধুনি যা রান্না করে তাই উপাদেয়। প্রমথ চৌধুরীর এই রাঁধুনিপনা ছিল, তাই তাঁর রচনার বিষয় যা হোক সবটাতেই রচনার স্বাদ থাকৃত, তাঁর সব আলাপই রসালাপ।"

প্রমথ চৌধুরীর রচনারীতির প্রথম গুণ ঃ আত্মসংযম—মিতভাষিতা। প্রাচীন ভারতে মিতভাষণের যে আদর ছিল তা এই থেকে বোঝা যায় যে, বৈয়াকরণ তাঁর সূত্রে একটি স্বরবর্ণ কমাতে পারলে পুত্রলাভের আনন্দ পেতেন। প্রমথ চৌধুরী প্রাচীন ভারতের মিতভাষণের ঐতিহ্যকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর রচনারীতির পরিচয় হচ্ছে ঃ তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা। অল্প

কথায় অনেক ভাবপ্রকাশের দুরূহ ক্ষমতা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। এই ক্ষমতা তাঁর সহজাত নয়, তিনি অর্জন করেছিলেন। তিনি ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটি বলতে পারতেন, তাই লাখ কথা বলার তাঁর দরকার হ'ত না। আমাদের অতিভাষণের দেশে তাঁর এই আত্মসংযম ও মিতভাষণ বিরল ব্যতিক্রম। বঙ্গ-সাহিত্যের নবযুগ প্রবন্ধে তিনি এই প্রসংগে বলেছেন: অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি ভাষায় পরিণত না হলে রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না। এই ধারণাটি যদি আমাদের মনে স্থান পেত, তা হলে আমরা সিকি পয়সার ভাবে আত্মহারা হয়ে কলার অমূল্য আত্মসংযম হতে ভ্রষ্ট হতুম না। (বীরবলের হালখাতা)।

প্রমথ চৌধুরীর লেখা পড়লে মনে হয় তিনি অবলীলাক্রমে লিখতেন। কিন্তু অবলীলাক্রমে রচনা করা আর অবহেলাক্রমে রচনা করা যে এক জিনিষ নয়, তা আমরা বুঝি না। এ বিষয়ে চৌধুরী মশাই উপরোক্ত প্রবন্ধেই আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। আর এখানেই তাঁর রচনারীতির দ্বিতীয় গুণ। কলাবতের সাধনা তাঁর ছিল। সরস্বতীর প্রতি অনুগ্রহ করে তিনি লেখেন নি, সরস্বতীর অনুগ্রহ পাবার জন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যে রূপ আছে, ভার নেই, ছায়া নেই।

হীরা মালিনীর পরিচয় দিতে গিয়ে ভারতচন্দ্র বলেছেন, "কথাতে হীরার ধার হীরা তার নাম।" প্রমথ চৌধুরীর মনে ছিল হীরার কাঠিন্য, তাঁর ভাষায় ছিল হীরার ধার ও ঝলক। বস্তুত এটাই তাঁর আদর্শ ছিল, "ভাষার এখন শানিয়ে ধার বার করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়।" হীরার এই ধার ও ঝলক প্রকাশ পেয়েছে পান্, এপিগ্রাম ও প্যারাডক্সের বহুল প্রয়োগে। প্রমথ চৌধুরীর রচনারীতির প্রধান গুণ এখানেই—শ্লেষ ও প্রসাদ, brevity ও clarity। বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল মনোভাবকে তিনি সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে এনেছিলেন ; তাই তাঁর রচনারীতিতে এসেছে শ্লেষগুণ। তাঁর মন ছিল স্বচ্ছ, সাবেককালের বা হাল আমলের কোনো ঝাঁকুনি বা কুয়াশা তাঁর মনকে ঘোলাটে করতে পারে নি, তাই তাঁর রচনারীতিতে এসেছে প্রসাদগুণ।

ভাষাশিল্পী হিসেবে তাই প্রমথ চৌধুরীর কৃতিত্ব অপরিসীম। ভাষাশিল্পীর পথ প্রলোভনে পিচ্ছিল। একদিকে সংস্কৃত ভাষার আড়ম্বর, অপরদিকে ইংরেজির অমেয় ঐশ্বর্য—দু'দিক থেকে প্রলোভন চৌধুরী মহাশয়কে হাতছানি দিয়েছে। কিন্তু তিনি আর্যমনের নির্মমতা ও নিরাসক্তির উত্তরাধিকারী, প্রাচীন বৈয়াকরণের পদচিহ্ন-অনুসারী। তিনি সমস্ত প্রলোভন ত্যাগ করে এগিয়ে গেছেন। পরিপাটি রচনার বাহক হিশেবে তন্বী রচনারীতি তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। চলতি ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা তিনি সাহিত্যের আমদরবারে দেখাতে চেয়েছিলেন। তাঁর রচনায় বাংলার ঘরোয়া ফ্রেজ ও ইডিয়ম সাহিত্যে ঠাঁই পেল; বাংলা বাক্য সুদীর্ঘ periodic sentence-এর নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বচ্ছ, সাবলীল ও স্বাভাবিক হয়ে উঠল; বাংলা ভাষার syntax আপন স্বরাজ্য ফিরে পেল। প্যারাডক্স ও এপিগ্রাম—এই দুই তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রে তিনি বাংলা গদ্যকে শাণিত ও পাঠকমনকে চমকিত করে তুললেন। সর্বোপরি চলতি ভাষাকে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা স্বীকার করিয়ে নিলেন। প্রাক্-সবুজপত্র যুগে রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষার চর্চা করেন নি তা নয়; তার প্রমাণ, 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র,' 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ,' 'ছিন্নপত্র,' 'শান্তিনিকেতন,' ও 'গোরা'র সংলাপ। কিন্তু সবুজপত্রের পাতাতেই রবীন্দ্রনাথ সরকারীভাবে চলতি ভাষাকে সাহিত্যের বাহন করে নিলেন 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে; জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই চলতি গদ্যেরই চর্চা করেছেন।

এবার প্রমথ চৌধুরীর গদ্যের উপরোক্ত গুণগুলির পরিচয় দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

প্যারাডক্সের উদাহরণ :

"তোমাদের মেয়ে প্রায় পুরুষ, আমাদের পুরুষ প্রায় মেয়ে। বুড়ো হলেও তোমাদের ছেলেমি যায় না,—ছেলেবেলাও আমরা বুড়োমিতে পরিপূর্ণ। আমরা বিয়ে করি যৌবন না আসতে, তোমরা বিয়ে কর যৌবন গত হলে। তোমরা যখন সবে গৃহপ্রবেশ কর, আমরা তখন বনে যাই।" ('আমরা ও তোমরা')।

এপিগ্রামের উদাহরণ ঃ

"ভট্টাচার্য-মতে, জীবনে ফেন ফেলে দিয়ে ভাত খেতে হয়, আর কাব্যে ভাত ফেলে দিয়ে ফেন খেতে হয়; কিন্তু গোস্বামি-মতে কি জীবনে কি কাব্যে একমাত্র গলা ভাতেরই ব্যবস্থা আছে।" ('ফরমায়েসি গল্প')

সমাজে আগে হয় বিয়ে পরে সন্তান, তারপরে মৃত্যু ; আর কাব্যে হয় আগে ভালবাসা, তারপর বিয়ে, নয় মৃত্যু। এক কথায় মানুষের জীবনে যা হয়, তার নাম প্রাণান্ত! কাব্য কিন্তু হয় মিলনান্ত, নয় বিয়োগান্ত; হয় ঘটক, নয় ঘাতক হওয়া ছাড়া কবিদের আর উপায় নেই।" (তদেব)।

খাঁটি বাংলা ফ্রেজ-ইডিয়ম ও স্ল্যাং-এর উদাহরণ :

"আমি যে শত চেষ্টাতেও 'রিণী'র মনকে আমার করায়ত্ত করতে পারিনি, তার জন্য আমি লজ্জিত নই—কেন না আকাশ বাতাসকে কেউ আর মুঠোর ভিতর চেপে ধর্‌তে পারে না। তার মনের স্বভাবটা অনেকটা এই আকাশের মতই ছিল, দিনে দিনে তার চেহারা বদলাত। আজ ঝড়-জল-বজ্র-বিদ্যুৎ, কাল আবার চাঁদের আলো, বসন্তের হাওয়া। একদিন গোধূলি আর একদিন কড়া রোদ্দুর। তা ছাড়া সে ছিল একধারে শিশু, বালিকা, যুবতী আর বৃদ্ধা। যখন তার স্ফূর্তি হত, তার আমোদ চড়্‌ত, তখন সে ছোট ছেলের মত ব্যবহার কর্‌ত ; আমার নাক ধরে টান্‌ত, চুল ধরে টান্‌ত, মুখ ভেংচাত, জিভ বার করে দেখাত।" ('চার-ইয়ারী-কথা')।

প্রমথ চৌধুরী অজস্রপ্রসবী লেখক ছিলেন না, তিনি লিখেছেন অল্প। তিনি দিয়েছেন মুষ্টিভিক্ষা—কিন্তু তা স্বর্ণমুষ্টি। তাঁর মতো সচেতন ভাষাশিল্পী—শব্দের অসিক্রীড়ার দক্ষ শিল্পী—বাংলা ভাষাকে সাবলীল ও উজ্জ্বল করে তুলেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ফরাসি-সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। বিরোধ-অলংকার ও ব্যঙ্গ-কটাক্ষের প্রয়োগে তিনি ফরাসি-স্বাধর্মের অনুসারী। চিন্তায় ও প্রকাশে তিনি অস্বাভাবিকতা ও অস্বচ্ছলতা বরদাস্ত করেন নি। তাঁর হাতে তাই চলতি বাংলা গদ্য কেবল রাজসম্মান পায়নি, তা স্বচ্ছ ও সাবলীল হয়েছে, তন্বী ও গাঢ়বদ্ধ হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী ভাষার ক্ষেত্রে রায়-গুণাকর

ভারতচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর "আত্মজীবনী"তে বলেছেন, "আমি কৃষ্ণনাগরিক। কৃষ্ণনগর আমার মুখে ভাষা দিয়েছে।" কৃষ্ণনগরের রাজসভা-কবি ভারতচন্দ্রের মতো তিনিও শ্লেষ ও ব্যঙ্গে, বক্রোক্তি ও বিরোধাভাসে নিপুণ ছিলেন। সেকালের কালচারের পীঠস্থান কৃষ্ণনগরের সুশ্রাব্য মার্জিত ভাষারূপকে প্রমথ চৌধুরী একালের পীঠস্থানে সাহিত্যের আমদরবারে চালাতে চেয়েছিলেন, তাঁর সম্পর্কে এটাই শেষ কথা।

প্রমথ চৌধুরী চেয়েছিলেন আমরা ফরাসি গদ্যের অনুশীলন করি। সাহিত্যে আনাড়িপনা, ভাষাপ্রয়োগে শৈথিল্য ও উদাসীনতা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে রাজি হন নি। তিনি বাঙালি লেখককে ইংরেজি গদ্যরীতি ত্যাগ করতে ও ফরাসি গদ্যরীতি গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "সঙ্গীতের মত সাহিত্যও যে একটি আর্ট, এবং যত্ন ও অভ্যাস ব্যতীত এ আর্ট যে আয়ত্ত করা যায় না, এ সত্য আমরা উপেক্ষা করতে শিখেছি। ইংরেজি গদ্যের কুদৃষ্টান্তই এর একমাত্র কারণ।......ইংরেজি সাহিত্যের amateurishness আমরা সাদরে অবলম্বন করেছি, কেননা যেমন-তেমন করে যা-হোক-একটা-কিছু লিখে ফেলার ভিতর কোনোরূপ আয়াস নেই, কোনোরূপ আত্মসংযম নেই। ফরাসি সাহিত্যের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দুইই লেখকদের সংযম অভ্যাস করতে শিক্ষা দেয়।" ('ফরাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয়', প্রবন্ধ সংগ্রহ)।

ফরাসি সাহিত্য ভাষাকে লঘু ও তীক্ষ্ণ, পরিচ্ছিন্ন ও পরিপাটী, সংযত ও ভদ্র হতে শেখায়, এই হল চৌধুরী মশায়ের অভিমত। "এ শিক্ষা আমরা সহজেই আত্মসাৎ করতে পারি, কেননা আমার বিশ্বাস, বাংলার সঙ্গে ফরাসি ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। আমাদের ভাষাও মূলতঃ এক, এবং বিদেশি শব্দে তা ভারাক্রান্ত নয়। আমাদের ভাষার অন্তরেও ফরাসি ভাষার গতি ও স্ফূর্তি নিহিত আছে। বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় কাব্যগ্রন্থ, জর্মানের ন্যায় স্থূলকায় গুরুভার শ্লীপদ ও গজেন্দ্রগামী ভাষায় রচিত হওয়া অসম্ভব। আমার বিশ্বাস, ভারতচন্দ্র যদি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে তাঁর প্রতিভা অনুকূল অবস্থার ভিতর

আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠত, এবং তার রচনা ফরাসি সাহিত্যের একটি মাস্টারপিস্ বলে গণ্য হত।" (তদেব)।

উল্লিখিত প্রবন্ধে চৌধুরী মশায় ফরাসি গদ্য থেকে আমরা কী শিক্ষা পেতে পারি, সে আলোচনা প্রসঙ্গে গদ্যের গুণ ও ত্রুটি বিচার করেছেন। তাঁর মতে ফরাসি গদ্য আদর্শ গদ্য এবং ভোল্‌ত্যের ও উগো এর দুই আদর্শ লেখক। ভোলত্যেরের হাতে ক্লাসিক ফরাসি গদ্য লঘু ও তীক্ষ্ণ, চোস্ত ও সাফ হয়েছিল। আর উগোর হাতে রোমান্টিক ফরাসি গদ্যের সৌন্দর্য খোলে ও শব্দসম্পদ বাড়ে। এই দুই গদ্যশিল্পী আমাদের নমস্য বলে তিনি মনে করেন।

ফরাসী গদ্যের যে গুণগুলি চৌধুরী মশায়কে আকৃষ্ট করেছিলন, তা হচ্ছে—ঐক্যসমতা, প্রসাদগুণ, ভদ্রতা, সংযম। প্রাক্-ষোড়শ শতক যুগের যে ফরাসি গদ্য, গ্রাম্য-বর্বরতা ও দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যদোষে তা দুষ্ট। রাবলের গদ্যই তার প্রমাণ। তা জোড়াতাড়া দেওয়া ভাষা। ষোড়শ শতকে কবি মালের্ব গদ্যের সংস্কার করেন। বাক্যের পদনির্বাচন ও পদযোজন, উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সংস্কার করেন। প্রাদেশিক শব্দ, ইতর শব্দ ও পাণ্ডিত্যগন্ধী পারিভাষিক শব্দ তিনি ফরাসি গদ্য থেকে বহিষ্কার করেন। সেই সঙ্গে বাক্যের গঠন যাতে পরিপাটী হয় ও পদান্বয় সুসমঞ্জস হয়, সে দিকেও জোর দেন। মালের্ব-প্রবর্তিত এই সংস্কারগুলি ফরাসি গদ্যকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। তারপর সতেরো শতকে সমালোচক বোয়ালো গদ্যরচনার ত্রুটিগুলির তীব্র সমালোচনা করেন। ভাষার কৃত্রিমতা, বৃথা বাগাড়ম্বর, উপমার আতিশয্য, অনুপ্রাসের ঝঙ্কার, অলঙ্কারের চাকৃচিক্যের বিরুদ্ধে তিনি জীবনব্যাপী অভিযান চালান। ফলে ফরাসি গদ্য থেকে অত্যুক্তি ও অতিবাদ, কষ্টকল্পনা ও অবোধ পাণ্ডিত্য দূর হয়ে যায়। ফরাসি গদ্য তাই লেখককে সংযম শিক্ষা দেয়, আপাতখ্যাতির পথ থেকে সরিয়ে আনে, ভাষার নির্মম সরণিতে এগিয়ে নিয়ে যায়। পাস্‌কাল, বস্যুয়ে, রাসীন, মলিয়ের, দেকার্তে এই পথেই সংযত অনুচ্ছসিত সুশৃঙ্খল গদ্যের চর্চা করে খ্যাতি লাভ করেছেন। তারপর ভোলত্যেরের হাতে ফরাসি গদ্য চরম লঘু ও তীক্ষ্ণ, চোস্ত ও সাফ্ হয়ে ওঠে। পরে উগো, ফ্লোবের, মোপাসাঁর হাতে ফরাসি গদ্য শব্দসমৃদ্ধি ও সাবলীলতা লাভ করেছে।

ফরাসি গদ্যের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনায় প্রমথ চৌধুরীর যে উদ্যম ও উৎসাহ, তা থেকে তাঁর মানসিক প্রবণতা স্পষ্ট ধরা পড়েছে। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, তিনি গদ্যের কোন্ রূপকে আদর্শ বলে মনে করেন এবং বাংলা গদ্যের কোন্ পথে যাওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। বাংলা গদ্য যে ফরাসি গদ্যের রীতি ও পথানুসারণেই মুক্তি পাবে, তা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। আর প্রমথ চৌধুরীর গদ্য পর্যালোচনা করে আমার মনে হয়েছে তিনি ফরাসি গদ্যশিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন আলফঁস্ দোদে-কে।

আলফঁস্ দোদে (১৮৪০-৯৭) মোপাসাঁর সমসাময়িক এবং গল্প লিখে তিনিও খ্যাতি লাভ করেন। তবে তাঁর খ্যাতির ভিত্তি হল দক্ষিণ ফ্রান্সের সুন্দর বর্ণনা এবং সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রাঙ্কন। দোদের গদ্যরীতির সন্ধানও এখানে পাই। ব্যঙ্গপ্রধান রচনার উপযোগী বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর গদ্যে লক্ষ্য করা যায়। সেই এপিগ্রাম্, প্যারাডক্স, আয়রনি, শ্লেষ, ব্যাজস্তুতি দোদের রচনায় রয়েছে। বার্লেস্ক-জাতীয় রচনায় আধা-গম্ভীর-আধা-বিদ্রূপ মেশানো ভঙ্গিতে সযত্নচয়িত শাণিত তীক্ষ্ণ বাক্যাংশ ও শব্দের ছিটাগুলিতে তিনি প্রতিপক্ষকে বিধ্বস্ত করে ফেলতেন। এই গুণগুলিই প্রমথ চৌধুরী সযত্নে চর্চা করেছিলেন। এবং প্রমথ চৌধুরীর রচনা ও দোদের রচনার পাশাপাশি রেখে পড়লে এই সাদৃশ্য বারেবারেই ধরা পড়ে। দোদে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু তাঁর সর্বাধিক খ্যাতি দুটি গ্রন্থের জন্য। একটি Letters de mon moulin (১৮৬৯), অপরটি Tratarin de Tarascon (১৮৭২)। প্রথমটিতে তাঁর নিজস্ব প্রভেন্স-অঞ্চলের নানা রসালো কাহিনী, দ্বিতীয়টিতে দখ্ণে ফরাসিদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা। উভয় গ্রন্থেই দোদের নিসর্গবর্ণনানৈপুণ্য ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

প্রমথ চৌধুরী যে দোদের গদ্যরীতি, বাক্‌ভঙ্গিমা এবং জীবনদর্শন দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার একটি প্রমাণ দিয়ে এই আলোচনা শেষ করছি। Letters de mon moulin গ্রন্থের অন্তর্গত Le chevre de M. Seguin ('মঁসিয়ে সেগুইনের ছাগল') শীর্ষক কাহিনীর প্রথম কয়েকটি বাক্য এখানে তুলে দিচ্ছি। তৎকালীন রোমান্টিক স্বাধীনচেতা বড় বড়

আদর্শে পূর্ণ অথচ ভীরু বোকা টাইপের কবিদের লক্ষ্য করে উগোর 'Notre-Dame de Paris' (১৮৩১) উপন্যাসের একটি চরিত্র—কবি Pierre Gringoire-র প্রতি উদ্দিষ্ট এই রচনাটিতে দোদে ঐ শ্রেণীর ন্যাকাবোকা কবিদের বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন। এই ব্যঙ্গবিদ্রূপ সত্যি উপভোগ্য।

রচনাটির আরম্ভ এই রকম :

A M. Pierre Gringoire, poete lyrique a Paris

Tu seras bien tonjours le meme, mon pauvre Gringoire !

Comment ! on t'offre une place de chroniqueur dans un bon journal de Paris, et tu as' l'aplomb de refuser...Mais regarde-toi, malheureux garcon ! Regarde ce pourpoint troue, ces chausses en deroute, cette, face maigre qui crie la faim.

Voila pourtant ou t'a conduit la passion des belles rimes ! Voila ce que t'ont valu dix ans de loyaux services dans les pages du sire Apollo......Est-ce que tu n'as pas honte, a la fin ?

Fais-toi donc chroniqueur, imbecile ! fais-toi chroniqueur ! Tu gagneras de beaux nobles a la rose, tu auras ton couvert chez Brebant, et tu pourras te montrer les jours de premiere avec une plume neuve a ta barrette......

Non ? Tu ne veux pas ? Tu pretends rester libre a ta guise jusqu'an bout......Eh bien, ecoute un peu l'historie de la chevre de M. Seguin. Tu verras ce que l'on gagne a vouloir vivre libre.

যিনি অল্পবিস্তর ফরাসি জানেন, তিনিই উধৃতাংশের অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সুরটি ধরতে পারবেন। এর মর্মার্থ হল: "ওহে বেচারী কবি! তোমাকে পারীর এক নামজাদা দৈনিক পত্রিকায় রিপোর্টারের কাজ দেওয়া হল, তা তুমি নিলে না! তোমার ছেঁড়া পোষাক আর শুক্‌নো বদনখানি ভাল করে দেখ! কবিতা লিখে তোমার কি লাভটা হয়েছে! দশ বছর ধরে ঘাস কেটেছ! এখন লজ্জিত হও, চলে এস। ওহে বোকা, রিপোর্টার হও, দুটো পয়সা হাতে আস্‌বে, ভালো রেস্তোঁরায় খেতে পাবে, আর তোমার খ্যাতি বাড়বে। কি? না বলছ? রাজি নও? তুমি দাসত্ব করবে না? চাকৃরি নেবে না? স্বাধীন কবি থাকবে? তাহলে মঁসিয়ে সেগুইনের ছাগলের যে দশা হয়েছিল, তোমারো তাই হবে। আজাদি রাখতে গিয়ে সে ছাগলের প্রাণটি খোয়া গেল, তবে শোনো সে কাহিনী।"

এর থেকেই উধৃতাংশের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সুরটি অনুধাবন করা যায়। আর মূল ফরাসি পড়লেই পাকা হাস্যরসিকের সকল বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। দোদের তুণে এপিগ্রাম-প্যারাডক্স, শ্লেষ-বিদ্রূপের বাণ মজুত ছিল এবং তা তিনি অনায়াস-নৈপুণ্যে ব্যবহার করতেন। বাক্যগঠনভঙ্গিটিও এই মনোভাবের পোষকতা করে।

এখানেই প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে আলফঁস্ দোদে-র সমধর্মিতা।

ঔপন্যাসিক হিশেবে শরৎচন্দ্র (১৮৭৬-১৯৩৮) আজো বাংলার জনপ্রিয় লেখক। বোধ করি তিনি জনপ্রিয়তম। আজো তাঁর বইয়ের বিক্রি সর্বাধিক। বাংলাদেশের পাঠকসমাজ শরৎচন্দ্রের মুগ্ধ ভক্ত কেন? শুধু কি গল্পমোহ, নারীমহিমা কীর্তন এবং জনপ্রিয় সমস্যাবলীর আলোচনা? আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্রের লিখননৈপুণ্য, তাঁর জাদুময়ী গদ্য, ঘরোয়া সংলাপ ও বর্ণনা এই জনপ্রিয়তা গড়ে তুলতে অনেকটা সাহায্য করেছে। এবং সাম্প্রতিক বাংলা গল্পোপন্যাসের ভাষার চেয়ে শরৎচন্দ্রের ভাষা অনেক সহজ ও শ্রুতি-সুখকর, একথা অনস্বীকার্য।

শরৎচন্দ্র তাঁর রচনা সম্পর্কে নানা সময়ে উত্থাপিত নানা অভিযোগের জবাব নিজেই দিয়েছেন। তা থেকে সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর মতামত জানা যায়। আর কয়েকটি প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র থেকে রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর মতামত জানা যায়। কিন্তু বাংলা গদ্য সম্পর্কে স্পষ্ট করে কোথাও কিছু বলেন নি। এক্ষেত্রে তাঁর রচনাই একমাত্র অবলম্বন। একটি মাত্র প্রবন্ধে—"আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ"এ—তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন: "বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা আমাদের কাহারও অপেক্ষা কম নয়, এবং সেই শ্রদ্ধার জোরেই আমরা তাঁহার ভাষা, ভাব পরিত্যাগ করিয়া আগে চলিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। মিথ্যা ভক্তির মোহে আমরা যদি তাঁহার সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার বস্তুই শুধু ধরিয়া পড়িয়া থাকিতাম, ত কেবলমাত্র গতির অভাবেই বাঙ্গলা সাহিত্য আজ মরিত।" (১৯২৯)। এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় শরৎচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে উদারমতাবলম্বী ও সংস্কারমুক্ত ছিলেন, কোনো কিছুকেই—যত প্রাচীন হোক না কেন—পবিত্র ও একমাত্র সত্য বলে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। 'শেষ প্রশ্নের' কমলের মত শরৎচন্দ্রও 'চলতি হাওয়ার পন্থী' ছিলেন—ভাষার ক্ষেত্রেও তিনি সংস্কারমুক্ত ছিলেন, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলে বোধ করি ভুল হয় না।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎ-গ্রন্থাবলীর যে তালিকা দিয়েছেন, তার

প্রথম বই 'বড়দিদি' (১৯১৩), শেষ বই 'শুভদা' (১৯৩৮)। শতাব্দীর একপাদ ধরে শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছেন এবং কিঞ্চিদধিক চল্লিশটি বই (গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ) লিখেছেন। এর মধ্য থেকে শরৎচন্দ্রের ভাষা ও গদ্যরীতির সন্ধান করা প্রয়োজন।

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এই দীর্ঘ সাহিত্য সাধনায় শরৎচন্দ্র একই গদ্যরীতি ব্যবহাব করেন নি—সাধু ও চলিত বাংলা তিনি ব্যবহার করেছেন। তবে তাঁর হাতে যে রীতি উৎকর্ষ লাভ করেছে, সে রীতি হল সাধু গদ্যরীতি। শরৎচন্দ্রেব অধিকাংশ গ্রন্থে এই সাধু বাংলা গদ্যের ব্যবহার দেখা যায়। একে তিনি সাবলীল ও সুগম করে তুলেছিলেন। শরৎচন্দ্র যখন বাংলা সাহিত্যে এলেন, তখন ১৯১৩। পর বছরই প্রথম চৌধুরী 'সবুজপত্র' পত্রিকা বার করলেন এবং 'বীরবলী' গদ্যের জুড়িগাড়ি হাঁকালেন। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর সহায়ক হলেন। কিন্তু আশ্চর্যেব বিষয়, 'বীববলী গদ্যরীতি' শরৎচন্দ্রকে কিছুমাত্র প্রভাবিত কবে নি। 'সবুজপত্রে'র পাতায় 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস ক্রমশঃ প্রকাশিত হল, এবং ১৯১৬ সালে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। এই ১৯১৬-তেই শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন ছেড়ে পাকাপাকি ভাবে বাংলা দেশে আসেন ও সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে (১৯১৪-১৬) প্রকাশিত শবৎ-গ্রন্থসমূহ হচ্ছেঃ 'বিরাজ-বৌ', 'বিন্দুর ছেলে' ও অন্যান্য গল্প, 'পরিণীতা', 'পণ্ডিত মশাই', 'মেজদিদি' ও অন্যান্য গল্প, 'পল্লীসমাজ', 'চন্দ্রনাথ', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'অরক্ষণীয়া'। ১৯১৭ সালে বেরুল 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব), 'দেবদাস', 'নিষ্কৃতি', 'কাশীনাথ', 'চবিত্রহীন'। ১৯১৮ সালে বেরুল 'স্বামী', 'দত্তা', 'শ্রীকান্ত' (২য় পর্ব)। এর পর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে 'গৃহদাহ' (১৯২০), 'দেনা-পাওনা' (১৯২৩), 'পথের দাবী' (১৯২৬), 'শ্রীকান্ত' (৩য় পর্ব) (১৯২৭), 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১), 'শুভদা' (১৯৩৮)। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থের এই মোটামুটি তালিকা। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, 'সবুজপত্র' ও 'কল্লোল' গোষ্ঠী যখন চলতি বাংলা গদ্যের জয়পতাকা ওড়াতে ব্যস্ত, তখন শরৎচন্দ্র দূরে থেকেছেন। সাধু বাংলা গদ্যের কাঠামোতে তিনি কাহিনীকে দাঁড় করিয়েছেন, কেবল পাত্রপাত্রীর সংলাপে চলতি গদ্যকে ব্যবহার করেছেন। শরৎচন্দ্রের গদ্যরীতিতে

যে প্রভাব স্পষ্ট হয়েছে, তা 'চোখের বালি'র গদ্যরীতি। গোড়ার দিকে শরৎচন্দ্র প্রাক্-সবুজপত্র-পর্বের রবীন্দ্র-গদ্যরীতির অনুকরণ করেছেন, তা অনস্বীকার্য।

শরৎচন্দ্রের গল্পোপন্যাসের বহিরঙ্গ বা কাঠামো সাধু গদ্যের, আর সংলাপ চলতি গদ্যের। একথাই যথেষ্ট নয়। শরৎচন্দ্রের ষ্টাইল বা গদ্যরীতি সম্পর্কে বলা দরকার, এখানে 'সাধুভাষা' ও 'চলিত ভাষা'র সুন্দর সমন্বয় সাধিত হয়েছে। চলিত ভাষায় স্বচ্ছতা ও সাবলীলতা এবং সাধু ভাষার ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির মধ্যে তিনি সামঞ্জস্য সাধন করেছিলেন। সাধু গদ্য ও চলিত গদ্য : এ দুয়েব মাঝে কোনো কৃত্রিম ব্যবধানের প্রাচীরকে শরৎচন্দ্র মানতে রাজি নন। বস্তুত, এ দুয়ের মধ্যে কোনো দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নেই, অন্ততঃ যে ভাষা প্রাণবাণ, তাতে এ ব্যবধান থাকা উচিত নয়। প্রমথ চৌধুরী এখানেই জোর দিয়ে, কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র অতি-সতর্ক লেখক। একই বর্ণনা একাধিকবার সংশোধন না করলে তিনি সন্তুষ্ট হতেন না। গদ্যস্রষ্টার সতর্কতা, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও পরিমিতি-বোধ এবং কলানৈপুণ্য তিনি বহু আয়াসে আয়ত্ত করেছিলেন। ভাগলপুর ও রেঙ্গুনে তিনি গদ্যসাধানায় নিজেকে নিনোজিত করেন। সে ইতিহাস পাঠকদৃষ্টির অন্তরালে থেকে গেছে।

শরৎচন্দ্রের ভাষা সতর্ক, সংযত, শান্ত। তাঁর ভাষার যে মাধুর্য, তা সংযমের মাধুর্য। তাঁর ভাষার যে লাবণ্য, তা শিল্পলাবণ্য। ভাষায় অতিরেক বা উচ্ছ্বাসের তিনি বিরোধী ছিলেন। শব্দপ্রয়োগে শরৎচন্দ্র যে অতি-সতর্ক ছিলেন তার প্রমাণ ভাষার এই সংক্ষিপ্ততা ও সংযম। শরৎ-উপন্যাসের শিল্পকৌশল অনবদ্য, সেই সঙ্গে রচনাসৌষ্ঠবও অবশ্যস্বীকার্য।

এই প্রবন্ধের গোড়ায় শরৎচন্দ্রের যে মন্তব্য উদ্ধার করেছি, তাতে দেখি, বঙ্কিমের গুরুগম্ভীর সাধু গদ্য ত্যাগ করাতেই বাংলা গদ্যের মুক্তি ঘটবে, এই ধারণা শরৎচন্দ্র পোষণ করেন। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি, তাই তাঁর সাধু গদ্য বা চলিত গদ্য—উভয়ত্রই মহাকবির হাতের ছাপ সুস্পষ্ট। শরৎচন্দ্র কবি নন,

তিনি বস্তুতান্ত্রিক গল্পলেখক, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে তাঁর সহজ অধিকার, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা, সংযত অনুচ্ছ্বসিত বিবরণে তাঁর আগ্রহ। অথচ তিনি সংবেদনশীল, হৃদয় বেদনা উদ্ঘাটনে যত্নবান, রোমান্টিক পরিবেশ-সৃজনে দক্ষ।

শরৎচন্দ্রের গদ্যরীতিতে লেখকের এই চরিত্র-লক্ষণগুলি প্রকটিত। তাই তাঁর গদ্যরীতিতে গাম্ভীর্য ও সংযম, স্বচ্ছতা ও সাবলীলতা, মাধুর্য ও কমনীয়তা, শান্তি ও লাবণ্যের একত্র সমাবেশ হয়েছে। চলিত গদ্য তিনি পাত্রপাত্রীর মুখে বসিয়েছেন। কিন্তু সদাসতর্ক ভাষাশিল্পীর নজর রয়েছে, এ সংলাপ যেন লঘু, তুচ্ছ ও হাটবাজারের ভাষায় পরিণত না হয়। তাই বলা যায়, শরৎচন্দ্রের গদ্যরীতিতে সাধু ও চলিত গদ্যের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। ফলে তাঁর ভাষা একেবারে নিরলঙ্কার গদ্যে পরিণত হয় নি, আবার অলঙ্কৃত মন্থরগতি গদ্যে পর্য্যবসিত হয় নি। বস্তুত এই সচেতনতা, বাস্তবতা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ-প্রবণতা, খুঁটিনাটির প্রতি ঝোঁক, এবং লাগসৈ শব্দচয়নে আগ্রহ : এই লক্ষণগুলি অনিবার্য ভাবেই উনিশ শতকের ফরাসি উপন্যাসিক ফ্লবের-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর লেখাতেও এমনি অতন্দ্র শিল্পবোধ ও সদাসতর্ক ভাষাশিল্পীর সাক্ষাৎ পাই যিনি উপরোক্ত বিষয়গুলিতে যত্নবান।

•

শরৎচন্দ্রের ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য—লাগ্‌সৈ শব্দের ব্যবহার, যেখানে যেটির প্রয়োজন নির্ভয়ে তার প্রয়োগ। এক্ষেত্রে তিনি কোনো পূর্বসংস্কারের দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন না। ফ্লবের্-এর গল্প-উপন্যাসেও এই গুণটি বর্তমান। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের কথা স্মরণ করুন, যেখানে শ্রীকান্ত রেঙ্গুনের বিখ্যাত হরিপদ মিস্ত্রীর কাছে রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। তার উত্তরে হরিপদ মিস্ত্রী যা বলেছিল তা একান্ত বাস্তব—ওই তার যথার্থ ভাষা—ওতেই তার চরিত্র সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত। হরিপদর উত্তর : "ওঃ মিস্তিরী! অমন সবাই নিজেকে মিস্তিরী কব্‌লাম ম'শায়। মিস্তিরী হওয়া সহজ নয়, মর্কট সাহেব যখন আমাকে বলেছিল, হরিপদ, তুমি ছাড়া মিস্তিরী হবার লোক ত কাউকে দেখ্‌তে পাইনে তখন বড় - সাহেবের কাছে কতখানি উড়ো চিঠি পড়েছিল

জানেন ?—একশখানি। আরে কাস্তের জোর থাক্‌লে কি উড়ো চিঠির কর্ম্ম ? —কেটে যে জোড়া দিতে পারি।" ফ্লবের্‌-এর "Un Coeur Simple" গল্পে যেখানে বুড়ী মিস্‌ট্রেস্‌ নায়িকা ফেলিসিতে-কে এক নিশ্বাসে না থেমে, লোভনীয় খাওয়া-দাওয়ার হাল্‌-হকিকৎ বাতলাচ্ছে, যেখানে ঐ একটি বাক্যেই অতি-ভাষিণীকে পাঠকের চেনা হয়ে যায়। বুড়ী ঝড়ের বেগে বল্‌ছে : Elle lui servit un dejeuner ou il y avait un aloyau, des tripes, du boudin, une fricassee de poulet, du cidre mousseux, une tarte aux compotes et des prunes a l'eau-de-vie, accompagnant le tout de politesses e Madame qui paraissait en meilleure sante, a Mademoiselle devenue magnifiqe', a M. Paul singulierement 'forci', sans oublier leurs grands-parents defunts que les Liebard avaient connus, etant au service de la famille depuis plusieurs generations. লক্ষ্য করুন, একটি মাত্র বাক্যে বুড়ী কি কি খাদ্য-পানীয় মিলবে, তা বাত্‌লাচ্ছে, আবার খেলে তারিফ করে কী মন্তব্য করতেই হবে, তাও বলে দিচ্ছে। বুড়ীকে চিন্‌তে আর কোনো বর্ণনার প্রয়োজন হয় না যেমন হরিপদ মিস্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়নি। আর এই দুই বর্ণনাতেই হাস্যরস—শ্লেষ অনুস্যূত হয়ে আছে, তা আমরা অনুভব করতে পারি।

শরৎচন্দ্রের শব্দচয়নে—উপমা ও রূপকের উদ্ভাবনে এই প্রত্যক্ষতা ও বাস্তবতার ছাপ রয়েছে। 'অরক্ষণীয়া'তে জ্ঞানদার মামী 'পোড়াকাঠ' এবং 'শ্রীকান্তে' অভয়ার স্বামী—যাকে দেখে মনে হল বর্মার কোন গভীর জঙ্গল থেকে এক বন্য মহিষের অকস্মাৎ আগমন হয়েছে ;—এই দুই ক্ষেত্রেই উপমা-উদ্ভাবনে শরৎচন্দ্র অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই কৃতিত্ব শরৎ-সাহিত্যে অবিরল।

নরনারীর প্রেম সম্পর্ক পরিস্ফুট করার জন্য শরৎচন্দ্র সুনির্বাচিত উপমা ও রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন বার বার। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে বর্মা-ফেরৎ শ্রীকান্ত যখন রাজলক্ষ্মীর ঔদাসীন্যে পীড়িত হয়, তখন শয়নগৃহে গিয়েই রাজলক্ষ্মীর

সুগভীর প্রেমের পরিচয় পায়। শ্রীকান্তর সেখানে মনে হল, যেন "ভাঁটার নদীতে আবার জোয়ারেব জলোচ্ছ্বাসের শব্দ মোহনার কাছে শুনা যাইতেছে।" সুরেশের মৃত্যুর পব অচলার মনেব ভাবের বর্ণনা ঃ "ভয় নাই, ভাবনা নাই, কামনা নাই, কল্পনা নাই—যতদূব দেখা যায়, ভবিষ্যতের আকাশ শুধু ধূ ধূ করিতেছে। তাহার রঙ নাই, মূর্তি নাই, গতি নাই, প্রকৃতি নাই,—একেবারে নির্বিকার, একেবারে একান্ত শূন্য।"

শরৎচন্দ্রের রচনারীতি কিন্তু কবিত্ববর্জিত নয়। প্রয়োজন মত কাব্যগন্ধী গদ্যের স্বতোৎসার লক্ষ্য কবা যায়। শ্রীকান্ত যে রাত্রে পিয়ারী বাইজীর কাছে নিজেকে সঁপে দিল ও পিয়ারী বুঝতে পারল তার প্রণয়ী তার জন্য সব কিছুই ত্যাগ করতে প্রস্তুত, সেদিন মধুর বেদনাময় ক্রন্দনে সে ভেঙে পড়ল। তার বর্ণনা কাব্যময় ঃ "পলকের জন্য দুজনে চোখোচোখি হইল এবং পবক্ষণেই সে বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। শুধু উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে তাহার সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। মুখ তুলিয়া চাহিলাম। সমস্ত বাড়ীটা গভীর সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন—কোথাও কেহ জাগিয়া নাই। একবার শুধু মনে হইল অন্ধকার রাত্রি তাহার কত উৎসবেব প্রিয় সহচরী পিয়ারী বাইজীর বুকফাটা অভিনয় আজ যেন অত্যন্ত পরিতৃপ্তিব সহিত দেখিতেছে।" (শ্রীকান্ত-২য় পর্ব)। "আঁধারে আলোর" প্রেমাবির্ভাবেব বর্ণনা ঃ "সবাই বুঝিবে না কি উন্মাদ নেশায় মাতিলে জল-স্থল, আকাশ-বাতাস সব রাঙা দেখায়, সমস্ত চৈতন্য কি করিয়া চেতনা হারাইয়া, একখণ্ড প্রাণহীন চুম্বকশলাকার মত শুধু সেই একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িবার জন্যই অনুক্ষণ উন্মুখ হইয়া থাকে।" এখানে উপমা-উৎপ্রেক্ষার ছড়াছড়ি!

শরৎচন্দ্রের রচনায় প্রকৃতি-বর্ণনা বিরল। মানবহৃদয়ের সম্পর্কিত প্রকৃতি-বর্ণনা এবং নিছক নিসর্গ-বর্ণনা ঃ এ দুই শ্রেণীর প্রকৃতি-বর্ণনা শরৎ-সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে দুই শ্রেণীর দুটি বর্ণনা উদ্ধার করেই ক্ষান্ত হবো। এ থেকেই শরৎ-গদ্যরীতির কাব্যলক্ষণটি প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রথমে মানবহৃদয় সম্পর্কিত প্রকৃতি-বর্ণনা। 'শ্রীকান্ত'র তৃতীয় পর্বে গঙ্গা-মাটিতে রাজলক্ষ্মী কর্তৃক অবহেলিত শ্রীকান্তের নিজ মনোভাবের বর্ণনা: "অদূরবর্তী কয়েকটা খর্বাকৃতির বাব্‌লা গাছে বসিয়া ঘুঘু ডাকিত, এবং তাহারি সঙ্গে মিলিয়া মাঠের তপ্ত বাতাসে কাছাকাছি ডোমেদের কোন একটা বাঁশঝাড় এম্‌নি একটা একটানা ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ করিতে থাকিত যে মাঝে মাঝে ভুল হইত সে বুঝি আমার নিজের বুকের ভিতর হইতেই উঠিতেছে।"

নিছক নিসর্গ বর্ণনায় যেখানে লেখকের কবিত্ব শক্তি চরমে পৌঁচেছে, তার বর্ণনা পাই 'শ্রীকান্ত'র প্রথম পর্বে—শ্মশানে রাত্রির রাত্রির রূপবর্ণনা: "চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশতলে পৃথিবী-জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্ব-চরাচর মুখ বুজিয়া, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপর যেন সৌন্দর্য-তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোরই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এত বড় ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে। এই যে আকাশ-বাতাস—স্বর্গ-মর্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি! এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত সীমাহীন—তাহা ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী আঁধার, সর্বালোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার।"

গদ্যশিল্পী হিশেবে তাই শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। বাংলা গদ্যরীতি গড়ে তুলতে যাঁরা সহায়তা করেছেন, শরৎচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। আগেই বলেছি, শরৎচন্দ্র সাধু ও চলিত গদ্যের সুন্দর সমন্বয় সাধন করে সাধু গদ্যরীতিকেই সাবলীল, স্বচ্ছ ও প্রাণবান্ করে তুলেছেন। কিন্তু কয়েকটি বিরল ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণভাবে চল্‌তি গদ্যকেই বাহন করেছেন। তার প্রধান উদাহরণ—'স্বামী' গল্পটি (১৯১৮)। 'স্বামী'র চল্‌তি ভাষার নমুনা: "আর সামাজিক বাধা আমাদের দুজনের মধ্যে যে কত বড় ছিল, এ শুধু যে তিনিই জান্‌তেন,

উনিশ শতকের প্রথম পাদে বাংলা গদ্যের প্রাথমিক অনিশ্চয় অবস্থা চলছিল। সে অনিশ্চয়তা থেকে দ্বিতীয় পাদে তাকে টেনে তোলেন বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গদ্যশিল্পীবৃন্দ।

তারপর গত শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে (অর্থাৎ দ্বিতীয়ার্ধে) বাংলা গদ্য সাহিত্যশ্রীমণ্ডিত হয়ে দেখা দিল, যুগপৎ ভাবের বাহন ও যুক্তির বাহন হয়ে উঠল। উপরে গস্ সাহেবের যে মন্তব্য তুলে দিয়েছি, তা 'বঙ্গদর্শন' গোষ্ঠীর লেখকদের গদ্য সম্পর্কে প্রয়োগ করা যায়।

এই গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বাংলা গদ্যের কি উৎকর্ষ বঙ্কিমচন্দ্র সাধিত করেছেন? এ প্রশ্নের জবাবে বলি:

"তাঁর আগে ভাষার মধ্যে অসাড়তা ছিল, তিনি জাগিয়ে দেওয়াতে তার যেন স্পর্শ-বোধ গেলে বেড়ে। নতুন কালের নানা আহ্বানে সে সাড়া দিতে সুরু করল। অল্পকালের মধ্যেই আপন শক্তির সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠল। বঙ্গদর্শনের পূর্বকার ভাষা আর পরের ভাষা তুলনা করে দেখলে বোঝা যায়, একপ্রান্তে একটা বড়ো মনের নাড়া খেলে দেশের সমস্ত মনে ঢেউ খেলিয়ে যায় কত দ্রুতবেগে, আর তখনি তখনি তার ভাষা কেমন করে নতুন নতুন প্রণালীর মধ্যে আপন পথ ছুটিয়ে চলে।"

(—রবীন্দ্রনাথ, 'বাংলাভাষা-পরিচয়', পৃঃ ৩৩)

উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সূচনা ও বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে গত শতকের প্রবন্ধ-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন, কেননা এ দুই ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। গত শতকের প্রবন্ধ-সাহিত্য দুটি ভাগে ভাগ করা চলে। এক, যুক্তিপ্রধান প্রবন্ধ, দুই, ভাবপ্রধান প্রবন্ধ। অনুরূপ ভাবে, বাংলা গদ্যও দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এক, যুক্তিপন্থী গদ্য, দুই কাব্যধর্মী গদ্য।

গদ্যরাজ্যে এ দুয়েরই ঠাঁই আছে। প্রবন্ধসাহিত্যে এ দুই শ্রেণীরই নিজস্ব ভূমিকা আছে। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজী গদ্য লেখকরা মূলত যুক্তিপন্থী ভারসহ দৃঢ়বদ্ধ সুশৃঙ্খল গদ্য রচনা করেন। জন বানিয়ান, উইলিয়ম টেম্পল, হালিফাক্স, ড্রাইডেন, লক, ডিফো, স্টীল, সুইফট্, এ্যাডিসন, বার্কলে যুক্তিবাহী

গদ্যকে সমৃদ্ধ করেন। উনিশ শতকের ইংরেজ লেখকরা প্রধানত ভাবপ্রধান আদর্শবাদী কাব্যগুণসমৃদ্ধ গদ্য রচনা করেন। কার্লাইল, ইমার্সন, থোরো, হ্যাজলিট, ডি কুইন্সি, রাস্কিন, স্টিভেনসন প্রমুখ লেখকরা এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ অলংকারসমৃদ্ধ ভাবাবেগবাহী গদ্য রচনা করে যশস্বী হন।

যুক্তির কঠিন ভূমির উপর ভাবের আবেগ-প্রবাহ বয়ে গেছে বলে ইংরেজী গদ্যের ভিত্তি দৃঢ়বদ্ধ আছে। আজ—বিশ শতকে—ইংরেজ গদ্যলেখকরা তাই নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে গদ্যচর্চা করেন।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, বাংলা গদ্যের এই ভিত্তিভূমি দৃঢ়বদ্ধ না হতেই তার ওপর দিয়ে ভাবের ও অলংকারের কোটাল-বান বয়ে গেছে। উনিশ শতকে যুক্তিপন্থী গদ্যের বহুল চর্চা না করেই আমরা কাব্যগুণসমৃদ্ধ আলংকারিক গদ্য-চর্চা করেছি। তার ওপর রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা গদ্য অপূর্ব শ্রী ও সুষমামণ্ডিত হয়েছে, অলংকারের নিক্কণে ও ধ্বনিরোলে আমরা দিশেহারা হয়ে গেছি। ফলে তাল রাখতে পারি নি—বাংলা গদ্যের আজ অবনতি ঘটেছে।

যুক্তিপ্রধান ভাববাহী টেঁকসই চিন্তাসমৃদ্ধ গভীর গদ্যের প্রয়োজন যে একান্ত, তা কি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে? এর অভাব থাকলে অলংকারসমৃদ্ধ গদ্যও শেষ পর্যন্ত দুর্বল ও পঙ্গু হয়ে পড়ে। তার প্রমাণ, আধুনিক বাংলা গদ্য। আজ যে আমরা রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে অসহায় বোধ করি, এর একমাত্র কারণ যুক্তি প্রধান ভারবাহী চিন্তাসমৃদ্ধ গদ্য-চর্চার অভাব। অথচ এই গদ্যকে বাদ দিয়ে কেবল কাব্যগুণসমৃদ্ধ গদ্য নিয়ে যে দুনিয়ার হাটে বিকিকিনি চলে না, তা আজ আমরা পদে পদে বুঝতে পারছি।

রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র যে যুক্তিপ্রধান ভারবাহী গদ্যের চর্চা করেছিলেন, তা বাংলার মনীষাকে গত শতকের উত্তরার্ধে বিকাশ লাভের পথ খুলে দিয়েছিল। তর্কের ভাষা, যুক্তির ভাষা, তত্ত্ব-প্রতিপাদনের ভাষা, দুরূহ বিজ্ঞান-চিন্তা ও দর্শন-চিন্তাকে প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করার ভাষা হচ্ছে এই লেখকদের ভাষা। এই ধারার সযত্ন চর্চা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র (বিবিধ প্রবন্ধ), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

কিন্তু এই যুক্তিপন্থী গদ্য ও প্রবন্ধের পাশাপাশি প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছিল ভাববাহী গদ্য—যা কাব্যগুণসমৃদ্ধ ও 'কেজো' গুণেব বিরোধী। বঙ্কিমচন্দ্রেই এর সূচনা (উপন্যাসাবলী ও 'কমলাকান্তের দপ্তর')। বমেশচন্দ্র দত্ত, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অক্ষয়চন্দ্র সবকার, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, সঞ্জীবচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, বলেন্দ্রনাথের হাতে এই ভাববাহী গদ্য পরিপুষ্টি লাভ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য মহাকাবির গদ্য। তাতে প্রাধান্য পেয়েছে ভাবুকতা; কাব্যগুণ ও অলংকাবৈশ্বর্য এসে যোগ দিয়েছে রবীন্দ্র-গদ্যে। সৃষ্ট হয়েছে অনুপম ও ধ্বনিরোলসমন্বিত ঐশ্বর্যশালী ছন্দমুখর গদ্য। এর প্রবল অভিভবে পড়ে বিশ শতকে প্রথমোক্ত ধারা পবাজিত হয়েছে। ফলে যুক্তিপন্থী গদ্য দুর্বল হযেছে, ভাববাহী গদ্য দিনে দিনে সমৃদ্ধ হয়েছে।

আজ তাই পরিণতি হয়েছে এই যে, চিন্তাশীলতা পবাজিত হযেছে ভাবুকতার কাছে। যুক্তিনিষ্ঠ সুশৃঙ্খল চিন্তার আদর্শ প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা আত্মগত ভাবকে বচনাদেহে ছড়িযে দেবার প্রবণতাই প্রবল হয়ে উঠেছে। আজ বাজনীতি-অর্থনীতি-ইতিহাস-বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ বচনার ক্ষেত্রে আমবা কত অসহায় ও দুর্বল বোধ করি। উনিশ শতকে এ দুই ধাবা সমান্তবাল পথে প্রবাহিত হয়েছিল। বিশ শতকে যদি যুক্তিবাহী গদ্যেব পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করতে পারি তাহলে আমাদের চিত্তক্ষেত্রে জাতীয় জাগবণ উপযুক্ত সমর্থন পাবে না। আজ তাই প্রয়োজন যুক্তিবাহী গদ্যের। ম্যাথু আর্নল্ডের কথা বলি: 'The needful qualities for a fit prose are regularity, uniformity, precision and balance'. এই ক'টি গুণেব চর্চা আজ বাংলা গদ্যলেখককে করতেই হবে। অন্যথায় বাংলা গদ্য দুর্বল ও অন্যনির্ভর হয়ে থাকবে।

গদ্যের ভবিষ্যৎ

হাল আমলে বাংলা গদ্যের বহুল চর্চা লক্ষ্য করে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি, এ গদ্য নদীর স্রোতের মত প্রাণচঞ্চল। ইদানীং যাঁরা ভালো লিখিয়ে বলে নাম করেছেন, তাঁরা কিন্তু সকলেই কুশলী গদ্যশিল্পী নন। কুশলী গদ্যশিল্পী হতে গেলে যে অতন্দ্র বিচারবুদ্ধি ও বাংলা বাক্যের ধ্বনি-সচেতন কান থাকা প্রয়োজন, তা সবার নেই। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। খ্যাতনামা লেখকের গল্প বা উপন্যাসের দুচার পাতা পড়লেই অযত্নবিন্যস্ত শিথিল গ্রন্থিবদ্ধ ভারসাম্যহীন বাংলা বাক্য ও ভুল শব্দ চোখে পড়বে। তাই আজ বাংলা গদ্য সম্পর্কে চিন্তা করার সময় এসেছে বলে আমার মনে হয়।

আমরা যখন বাংলা গদ্যের চর্চা করি—বলি এবং লিখি, তখন আমরা স্থির-নিশ্চয় নই—আমরা কোন্ পথানুসারী ; আমরা কি মনের ভাবকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশে ব্যস্ত হব, না, গদ্যকে শোভন ও ভদ্র করব ? এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব আমাদের ভুল শব্দ প্রয়োগের মূলে রয়েছে। তাই এক্ষেত্রে আমাদের সংস্কারমুক্তি ঘটা প্রয়োজন।

কথাটি আরও স্পষ্ট করা প্রয়োজন। শব্দ ব্যবহারে ও বাক্য গঠনে কোন পূর্বনির্ধারিত আদর্শের নিগড়ে নিজেদের বেঁধে রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। গদ্যের মূলমন্ত্র—স্বচ্ছতা, যথাযথতা, নিরাসক্ত নিরাভরণ বিবৃতি। প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক ম্যাথু আর্নল্ড বলেছেন—“The needful qualities for a fit prose are regularity, uniformity, precision and balance.”

এই ক'টি গুণের চর্চা আজ বিশেষ প্রয়োজন।

এই ক্ষেত্রে আমাদের পথের নিশানা দিতে পারেন চার প্রধান—বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী। এঁরা সবাই শব্দ-ব্যবহারে উদার ছিলেন।

বিদ্যাসাগরকে আমরা জানি সাধু-গদ্যের স্রষ্টা বলে। কিন্তু বাংলা গদ্যরাজ্যে তাঁর কৃতিত্ব এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি কেবল “শকুন্তলা” “সীতার বনবাস”

লেখেননি, "ব্রজ-বিলাস", "অতি অল্প হইল", "আবার অতি অল্প হইল" প্রমুখ কেতাবও লিখেছিলেন। শেষোক্ত বই তিনটি তিনি "কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য" এই বেনামীতে লেখেন। এগুলিতে তিনি প্রচুর পরিমাণে দেশী, আরবী, উর্দু, ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন। টেকচাঁদ, হুতোম, দীনবন্ধু মিত্র যে রকম অবলীলাক্রমে কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন, বিদ্যাসাগর মশায়ও তাই করেছেন। বিদ্যাসাগরের কথ্যভাষা ও খোশমেজাজের পরিচয় পেতে হলে এই তিনটি বই সযত্নে পড়া দরকার। শব্দপ্রয়োগে তিনি যে কত মুক্ত-সংস্কার ও প্রগতিশীল ছিলেন, তার প্রমাণ এই শব্দগুলি: "বেহুদা পণ্ডিত", "সংস্কৃত বিদ্যায় ফাজিল", "বেয়াড়া খ্যাতি", "হঙদার", "বিদকুটে", "তুয়াক্কা", "দিল-দরিয়া", "তুখড় ইয়ার", "ফচকিয়ামী", "ছরকট করিয়াছেন", "লেজ নাড়িতেছেন" ইত্যাদি। "অতি অল্প হইল" ও "আবার অতি অল্প হইল" বইতে এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে।

"ব্রজবিলাস" থেকে উদ্ধৃত এই অংশটিতে দেশী-বিদেশী শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করুন: "**ফাজিল চালাকেরা** স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মত বিজ্ঞ বোদ্ধা যোদ্ধা ভূমণ্ডলে, আর নাই। তাঁহারা যে বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত করেন, অন্যে যাহা বলুক তাঁহাদের মতে তাহা অভ্রান্ত ও অকাট্য। শুনিতে পাই আমার এই ক্ষুদ্র মহাকাব্যখানি অনেকের **পছন্দ**-সই জিনিষ হইয়াছে। সেই সঙ্গে ইহাও শুনিতে পাই, **ফাজিল চালাকেরা** রটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা বিদ্যাসাগর লিখিত। যাঁহারা সেরূপ বলেন, তাঁহারা যে নিরবচ্ছিন্ন **আনাড়ি** তাহা এক কথায় সাব্যস্ত করিয়া দিতেছি।

"এক গণ্ডা মাস অতীত হইল, বিদ্যাসাগর **বাবুজি**, অতি **বিদকুটে** পেটের পীড়ায় **বেয়াড়া** জড়ীভূত হইয়া পড়িয়া **লেজ নাড়িতেছেন**, উঠিয়া পথ্য করিবার **তাকত** নাই। এ অবস্থায় তিনি এই **মজাদার** মহাকাব্য লিখিয়াছেন, একথা যিনি রটাইবেন, অথবা এ কথায় যিনি বিশ্বাস করিবেন, তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় কত তাহা সকলে স্ব স্ব প্রতিভাবলে অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন।"

উদ্ধৃত অংশে মোটা অক্ষরের শব্দগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, বিদ্যাসাগর

শব্দ-প্রয়োগে কত উদার ও মুক্তসংস্কার ছিলেন, লাগসই কথা প্রয়োগে তিনি পেছ-পা হননি।

বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাষার ক্ষেত্রে কত উদার ও প্রগতিপন্থী ছিলেন, তার প্রমাণ "কমলাকান্তের দপ্তর" ও "মুদিরাম গুড়ের জীবনচরিত"। "চন্দ্রশেখর", "দেবী-চৌধুরাণী", "বিষবৃক্ষ", "কৃষ্ণকান্তের উইল" প্রভৃতি আঠার-উনিশ শতকের পটভূমিকায় লিখিত উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী ও ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছেন। আবার "রাজসিংহ" উপন্যাসে প্রচুর পরিমাণে উর্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন। প্রয়োজনে বঙ্কিম সকলের কাছেই হাত পেতেছেন, নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি।

রবীন্দ্রনাথও ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কার-মুক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বারবার বলেছেন, চলতি ভাষা দুয়োরাণী, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিত হবে তারই। "চলতি ভাষার চলার বিরাম নেই, তার চলবার শক্তি আড়ষ্ট হবার সময় পায় না। আমাদের দিনরাত্রির মুখরিত সব কথা ঝরে পড়ছে তার মাটিতে, তার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে তার প্রকাশের শক্তিকে করেছে উর্বরা।" এই চলতি ভাষার জোর কোথায় তা আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাংলায় চলতি ভাষা বহুকাল ধরে জায়গা পেয়েছে সাধারণ মাটির ঘরে, হেঁশেলের সঙ্গে, গোয়ালের ধারে, গোবর-নিকানো আঙিনার পাশে, যেখানে সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপ জ্বালানো হয় তুলসীতলায় আর বোষ্টমী এসে নাম শুনিয়ে যায় ভোরবেলাতে।" (বাংলা ভাষা পরিচয়—পৃঃ ৩৯)।

এই বর্ণনা কেবল চলতি ভাষার ওকালতি নয়, তার প্রত্যক্ষ সমর্থনও বটে। এই দুটি বাক্যে রবীন্দ্রনাথ অবলীলায় মেয়েলী শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাতে তাঁর বাধেনি। কিন্তু তাই বলে তিনি একদেশদর্শী ছিলেন না। তার প্রমাণ, তিনি বলছেন, "এইখানে একথা স্বীকার করতেই হবে, সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলা ভাষা অচল। কী জ্ঞানের কী ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে, ততই সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ-বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে।" (বাংলা ভাষা পরিচয়', পৃঃ ৪১)। ভাষার ক্ষেত্রে

রবীন্দ্রনাথ যে সংস্কারমুক্ত উদার ছিলেন তার প্রমাণস্বরূপ দাখিল করতে পারি এই মন্তব্যটি,—ভাষার অবিমিশ্র কৌলীন্য নিয়ে খুঁৎখুঁৎ করেন এমন লোক আজও আছেন। কিন্তু ভাষাকে দুইমুখো করে তার দুই বাণী বাঁচিয়ে চলার চেষ্টাকে অসাধু বলাই উচিত। ভাষার এরকম কৃত্রিম বিচ্ছেদ জাগিয়ে রেখে আচারের শুচিতা বানিয়ে তোলা পুণ্যকর্ম নয়, এখন আর এটা সম্ভবও হবে না।" (বাংলা ভাষা পরিচয়—পৃঃ ৪৩)।

রবীন্দ্রনাথ শব্দ আত্মসাৎ করার ব্যাপারে যে কত উদার ছিলেন, তার প্রমাণ দেওয়া যাক "লিপিকা" বইটি (১৯২২) থেকে। গদ্য ও পদ্যের সীমানায় অবস্থিত এই বইয়ের ভাষা, কিন্তু সর্বত্র কোমল ও কাব্যগন্ধী নয়, তা প্রখর ও সাবলীলও। সংস্কৃত, দেশী, বিদেশী—নির্বিচারে সকল শব্দই তিনি প্রয়োজনের খাতিরে গ্রহণ করেছেন, অথচ কোথাও ভাষার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি, স্ল্যাং-এ পরিণত হয়নি।

সংস্কৃতপ্রধান ভাষার নমুনা : "সেই আকাশ-পৃথিবীর বিবাহ-মন্ত্র-গুঞ্জন নিয়ে নববর্ষা নামুক আমাদের বিচ্ছেদের পরে। প্রিয়ার মধ্যে যা অনির্বচনীয় তাই হঠাৎ-বেজে-ওঠা বীণার তারের মতো চকিত হয়ে উঠুক। সে আপন সিঁথির 'পরে তুলে দিক দূর বনান্তের রংটির মতো তার নীলাঞ্চল; তার কালো চোখের চাহনিতে মেঘমল্লারের সব মীড়গুলি আর্ত হয়ে উঠুক। সার্থক হোক বকুলমালা তার বেণীর বাঁকে বাঁকে জড়িয়ে উঠে।" (মেঘদূত)

দেশী শব্দ প্রয়োগের নমুনা : "এ হাওয়ার আগে ছুটতে চায়, অসীম আকাশকে পেরিয়ে যাবে বলে পণ করে বসে। অন্য সকল প্রাণী, কারণ উপস্থিত হলে দৌড়য় ; এ দৌড়য় বিনা কারণে ; যেন তার নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত সখ। কিছু করতে চায় না, কাউকে মারতে চায় না, পালাতে চায়। পালাতে পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম্ হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তারপরে না হয়ে যাবে, এই তার মৎলব।" ('ঘোড়া')

বিদেশী শব্দ-প্রয়োগের নমুনা : "কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ প্রশ্নকে ঠেকানো যায় না : 'খাজনা দেব কিসে ?' শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হাহা করে তার উত্তর আসে, আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান্ দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।" ('কর্তার ভূত')

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই, কি সংস্কৃত, কি দেশী, কি বিদেশী—যে শব্দই প্রযুক্ত হক না কেন, হয়েছে তার প্রয়োগ অপরিহার্য বলে, জোর করে আসেনি, চল্‌তি ভাষার চাল কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। আর এই-ই হল সার্থক গদ্যের মূল মন্ত্র—স্বাভাবিকতাকে রক্ষা করা।

বাংলা গদ্যের অন্যতম প্রধান গদ্যশিল্পী প্রমথ চৌধুরী ঠিক এই প্রসঙ্গের আলোচনায় বলেছেন, "ভাষার এখন শানিয়ে ধার বার করা আবশ্যক, ভার বাড়ান নয়। যে কথাটা নিতান্ত নহিলে নয়, সেটি যেখান থেকে পার নিয়ে এসো, যদি নিজের ভাষার ভিতর তাকে খাপ খাওয়াতে পার। কিন্তু তার বেশী ভিক্ষে, ধার, কিম্বা চুরি করে এনো না।" ('কথার কথা', বীরবলের হালখাতা')

এই প্রসঙ্গে উদাহরণ দেওয়া যায় এই বাক্যটি—"ঘরের ছেলে ঘরে যাও, ঘরের ভাত বেশী করে খেয়ো!" এই বাক্যটি হতে কোথাও 'ঘর' তুলে 'গৃহ' স্থাপনা করে দেখুন—তা কানেই বা কেমন শোনায়, আর মানেই বা কত পরিষ্কার হয় ? বরং তার অর্থ সম্পূর্ণ উল্টে যায়। আসল কথাই এই, যেখানে যা লাগসই, সেখানে তা নির্দ্বিধায় প্রয়োগ করতে হবে, তার পথে কোনো দ্বিধা, সঙ্কোচ বা সংস্কারের ঠাঁই নেই। এদের প্রশ্রয় দিলে ভাষার ভদ্রতা রক্ষা হবে, কিন্তু প্রাণ রক্ষা হবে না। আর বঙ্কিম-রবীন্দ্র-প্রমথ—এই তিন ওস্তাদের আশ্বাসের পর আমরা যদি ভরসা না পাই, তবে কোনদিনই বাংলা ভাষার সংস্কারমুক্তি ঘটবে না। অথচ ভাষার উন্নতি ও প্রগতি নির্ভর করে এই উদারদৃষ্টি ও সংস্কারমুক্তিতে, তার প্রমাণ ইংরেজী ভাষা। ইংরেজী দুনিয়ার তাবৎ ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে বেমালুম আত্মসাৎ করেছে—এই

গ্রহণ, ঔদার্য ও আত্মসাতের ক্ষমতা ইংরেজীকে দিয়েছে বেগ ও চাঞ্চল্য। একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়—'Admiral' কথাটি ইংরেজীতে সুপ্রচলিত এবং তা ইংরেজী উৎসজাত বলে প্রচলিত। অথচ এর উৎস আরবী শব্দ—'আমীর-উল্-বহর'।

বাংলা ভাষায় আমরা দেশী-বিদেশী শব্দ অনেক গ্রহণ করেছি, কিন্তু তার প্রয়োগে সব সময় দ্বিধামুক্ত নই। ফল হয়েছে এই সাধুভাষা ও চলতি ভাষার ব্যবধান ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে কমবার কোনো লক্ষণ নেই। অথচ এ দুয়ের মিলনেই বাংলা গদ্যের মুক্তি, একথা একাধিকবার রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী ঘোষণা করেছেন।

একথা আমাদের স্পষ্ট করে জানা প্রয়োজন, গদ্য চর্চার লক্ষ্য বুদ্ধি ও যুক্তির অনুশীলন, ভাবালুতা ও আবেগের উপর বিচারের জয় ঘোষণা। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা যাকে বলেছেন প্রসাদগুণ, ইংরেজিতে তাকেই বলেছে clarity. এই প্রাঞ্জলতা, স্বচ্ছতা ও সরলতা গদ্যের প্রধান ধর্ম। গদ্য ভাষা বিশেষ করে কাজের ভাষা, বুদ্ধির ভাষা, জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের ভাষা; অপর পক্ষে ভাব ও আবেগের ভাষা, কাব্যের ভাষা। গদ্যের এই প্রধান ধর্ম—স্বচ্ছতার উপরেই সকল সার্থক গদ্যলেখক জোর দিয়ে থাকেন। আঠারো শতকের ইংরেজী গদ্যে বা ফরাসি গদ্যে এই স্বচ্ছতা ও প্রাঞ্জলতারই সাধনা! বাংলা গদ্যরাজ্যে এর প্রধান সাধক হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রসাদগুণযুক্ত গদ্যরীতিই বঙ্কিমের গদ্যরীতি। এতেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। 'ইন্দিরা'র শেষ সংস্করণ 'লোকরহস্য', 'বাঙ্গালার কৃষক', 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র এই 'কাজের' গদ্য, প্রাঞ্জল গদ্য, স্বচ্ছ যুক্তির গদ্য লিখেছেন। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার, ভূদেব, এবং পরবর্তী হরপ্রসাদ, রামেন্দ্রসুন্দর ও বিবেকানন্দ বঙ্কিমের সহগামী। এঁরাই বাংলা গদ্যের ধ্রুপদী রূপটি গড়ে তুলেছেন। প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ তাতে দিয়েছেন কথ্যভাষার বেগ ও মনোহারিত্ব। কিন্তু আজ প্রয়োজন কাব্যধর্মী উচ্ছ্বাসময় গদ্য নয়, চটুল

ভঙ্গিসর্বস্ব গদ্য নয়, চাই কাজের গদ্য—যা বুদ্ধি ও যুক্তির পথে চলে, গুরুচিন্তাভার-বহনে সক্ষম হয় এবং স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল হয়। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র মহাগুরু, তাঁর পথেই আমরা এগিয়ে যাব। বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা-ই আমাদের পালনীয়।

বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট করে বলেছেন: "বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, —সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য; সরলতা ও স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য—সে স্থলে সৌন্দর্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কোন্ উচ্চ ভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদী বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু-প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্যসিদ্ধি না হয়, আরও উপরে উঠিবে। প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে। যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজী, ফার্সি, আরবী, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তারপর সেই রচনাকে সৌন্দর্যবিশিষ্ট করিবে—কেননা, যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপর তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে—লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা

শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজেকাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে।" (বঙ্গদর্শন, ১২৮৫, জ্যৈষ্ঠ, 'বাঙ্গালা ভাষা')।

সাম্প্রতিক বাংলা কথা-সাহিত্যের প্রসার ও প্রভাব নিঃসন্দেহে বেড়ে চলেছে, এ বিষয়ে কোনও ভুল নেই। বস্তুত, এই শাখা বর্তমানে সর্বাপেক্ষা ফলবান ও সবল। কিন্তু এই শাখায় যে গদ্যলেখকদের পাই, তাঁরা সবাই সচেতন ভাষাশিল্পী নন। সেইজন্য বাক্যগঠনে ত্রুটি, শব্দের ভুল প্রয়োগ, বাগ্‌ভঙ্গীর আড়ষ্টতা, ইডিয়মের অপপ্রয়োগ মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে। বাংলা গদ্যের সযত্ন চর্চার অভাবই এই সব ত্রুটির মূলে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "বঙ্গদর্শন" পত্রিকার "নবীন লেখকদিগের প্রতি" যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা যদি সাম্প্রতিক কথাকার পালন করেন, তাহলে বাংলাগদ্যের উন্নতি ঘটবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সযত্ন অনুশীলনের উপর প্রমথ চৌধুরী বার বার জোর দিয়েছেন। রামপ্রসাদ বলেছেন, 'তোব মন কর রে পরিপাটি'। প্রমথ চৌধুরী তাঁর গদ্য ও রচনারীতিকে পরিপাটি করেছিলেন। মেদচ্ছেদ-কৃশোদরা ক্ষীণমধ্যা সবলা বাংলাভাষার পরিপাটি তন্বী রূপ আয়ত্তে আনতে গেলে প্রয়োজন—সযত্ন অনুশীলন। সাম্প্রতিক দিনের সকল কথাকারই সচেতন-গদ্যশিল্পী হবেন, এটাই আশা কবি। বস্তুত, এ'দের হাতেই বাংলা গদ্যেব সংস্কারমুক্তি ঘটবে, শানিযে ধাব বার করবেন এঁরাই, আমরা—সাধারণ পাঠক—তাঁদের সযত্ন অনুশীলনের ফল ভোগ করব, এই আমার প্রত্যাশা।